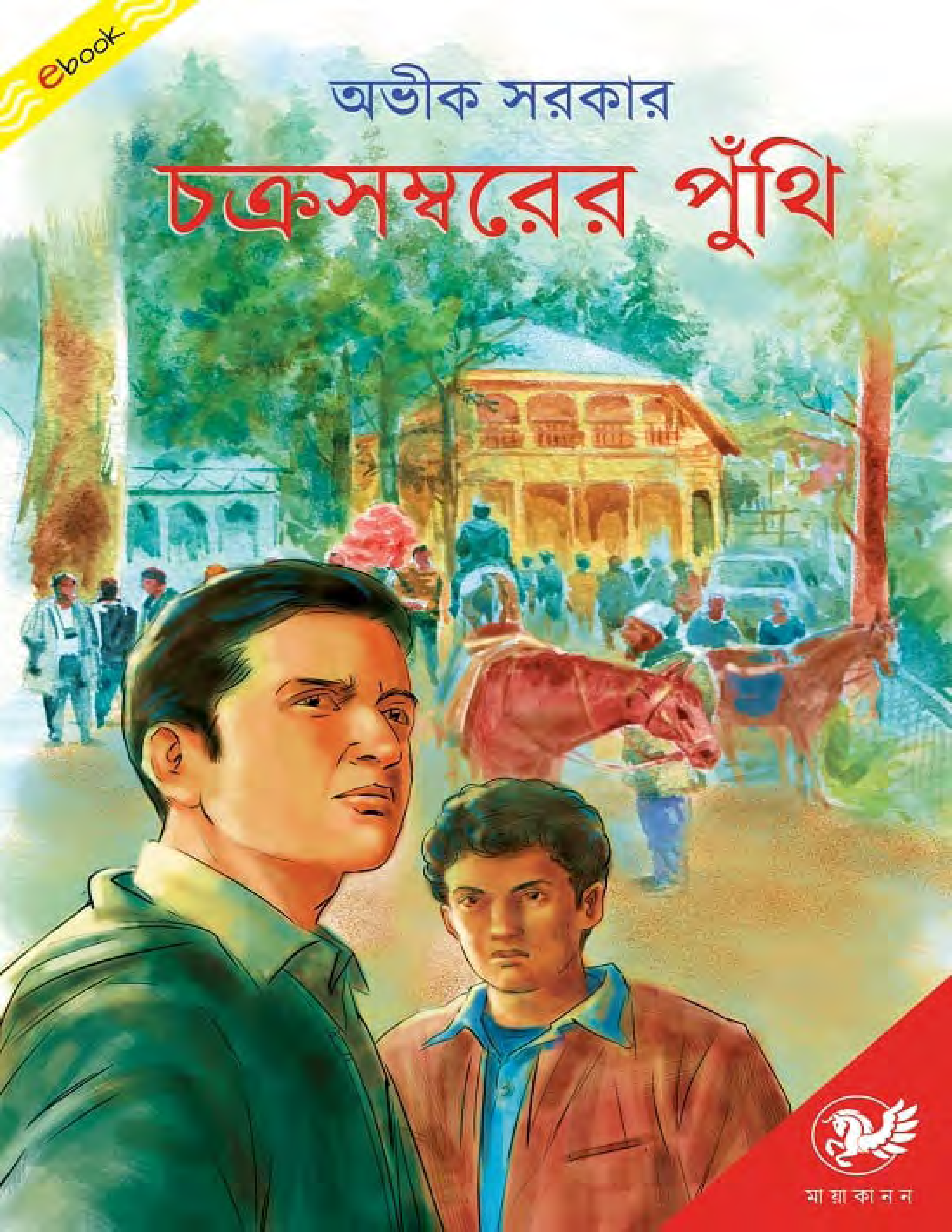
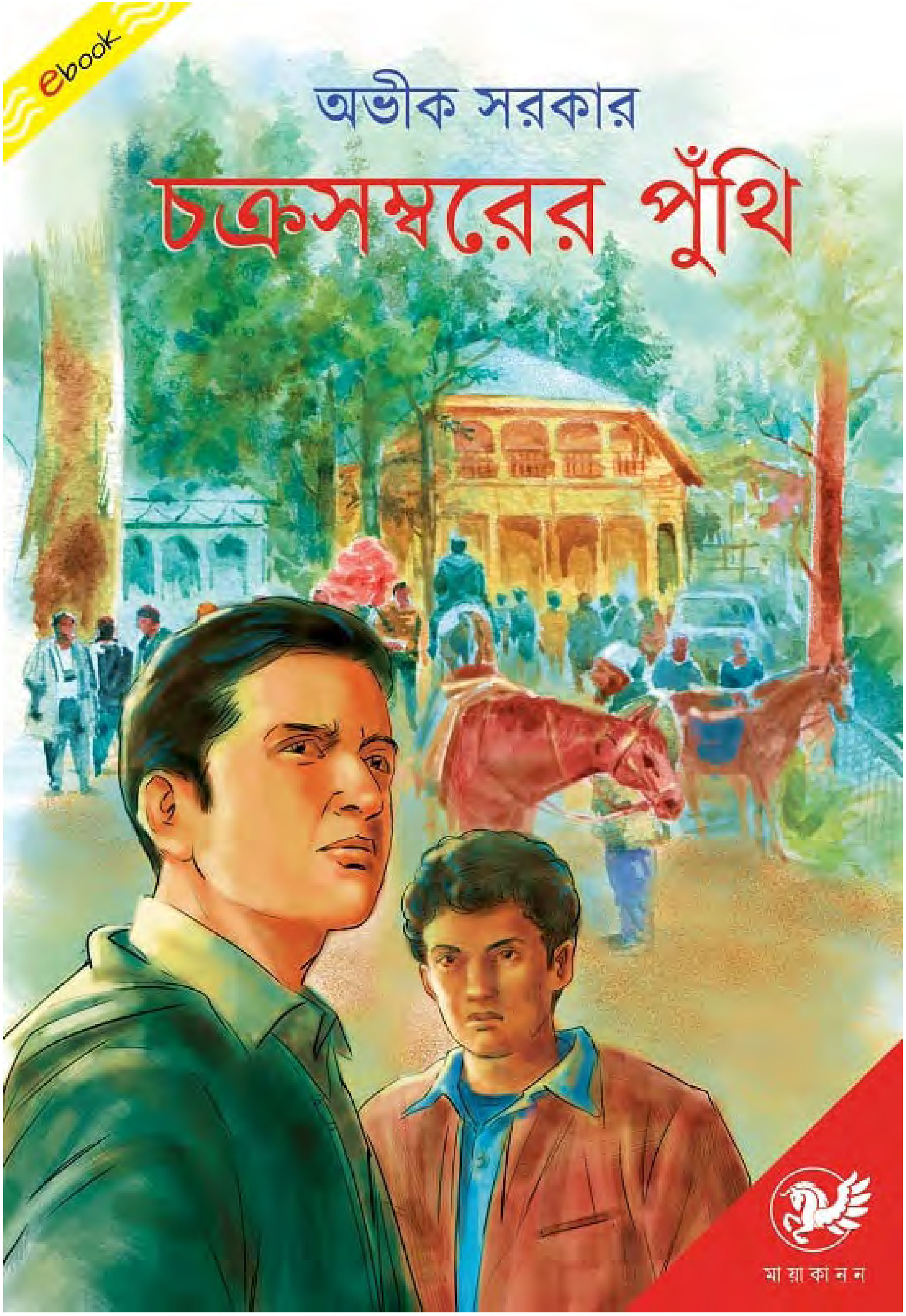

ebook
অভীক সরকার
চক্রসম্বরের পুঁথি
মায়াকানন


ebook
অভীক সরকার
চক্রসম্বরের পুঁথি
মায়াকানন

অভীক সরকার

চক্রসম্বরের পুঁথি



মায়াকানন
ebook

MAYAKANON
8B Roypara Road, P.O- Sinthee,
Kolkata- 700050
Contact- 9233001275/9233001285

Chakrasambarer Punthi by Avik Sarkar

ISBN 978-81-944453-1-9

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০২০

মায়াকাননের পক্ষ থেকে অর্ক পৈতণ্ডী কর্তৃক
৮ বি রায়পাড়া রোড, পোস্ট- সিঁথি,
কলকাতা- ৭০০০৫০ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ- ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
ই-বুক নির্মাণ- মায়াকানন

১০০ টাকা (ই-বুক)
Optimized for Swiftboox Platform by Team Swiftboox

উ ৎ স র্গ
শ্রীমতী শর্মিলা পান এবং শ্রীপ্রবীর পান।
যে দু'জন মানুষ আমাকে জামাই হিসেবে নয়, নিজের ছেলের মতোই ভালোবেসে এসেছেন গত চোদ্দ বছর ধরে, তাঁদের করকমলে।

ভূ মি কা

সে এক প্রখর রৌদ্রকরোজ্জ্বল জুনস্য প্রথম দিবস। অফিসে বসে প্রবল গরমে ঘামছি আর ভাবছি যে এত গরম লাগে যখন, তখন তো তিব্বত গেলেই হয়, এমন সময়ে এই সময়ের সেরা ইলাসাট্রেটর তথা মায়াকানন-এর সম্পাদক সুবিখ্যাত অর্ক পৈতণ্ডীর ফোন। মোবাইলটা কানে তুলতেই ভদ্রলোক আমাকে মায়াকানন বার্ষিকী ২০১৯-এর জন্য উপন্যাস লেখার কথাটা মধুমাখা স্বরে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মনে পড়ে গেল যে গত বছর মায়াকানন বার্ষিকীতেই ‘কালিয়া মাসান’ নামক একটি নভেলা লিখেছিলাম বটে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে নভেলাটি কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়ও হয়। পরে সুবিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত ‘খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ’ বইটিতে উপন্যাসিকাটি স্থান পেয়েছে। তারও মার্কেট রিপোর্ট শুনেছি খারাপ না।

এ-ও মনে পড়ে গেল যে ‘কালিয়া মাসান’ পড়ার পর অগ্রজ সাহিত্যিক শ্রীসৌরভ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে তন্ত্র-টন্ত্র তো অনেক হল, এবার অন্য ধরনের লেখা লিখি না কেন? অগ্রজের পরামর্শ গুরুর আদেশতুল্য। এমনকি ‘মিশন পৃথিবী’ নামক ব্লকবাস্টার বইটির লেখিকা, ‘তিতিরপাখি ও প্রিন্সেস’-এর সহলেখিকা এবং সুহৃদ অনুষ্টুপ শেঠও অনেকদিন ধরেই খোঁচাচ্ছিলেন একটা ‘ডিটেক্টিভ নবেল’ লেখার জন্য। ‘চক্রসম্বরের পুঁথি’ লেখার দুঃসাহস তারই ফলশ্রুতি। শেষমেশ এ যে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে বলতে পারব না। তবে আমি ছোটবেলায় যেমন গোয়েন্দা গল্প পড়তে পছন্দ করতুম, তেমনটি লিখতে চেয়েছি, এইটুকু বলতে পারি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কাহিনির মূল ধরতাই পেয়েছি ভগিনীসমা ঋতুপর্ণা চক্রবর্তীর কাছ থেকে। অনুরোধ করামাত্র তিনি খুশিমনে তাঁর স্বপ্নাদ্য প্লটটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। অতএব যদি নিতান্ত বাজে লিখে থাকি তাহলে অর্ধেক গাঁট্টা এই মহিয়সীরও প্রাপ্য।

গল্পের মধ্যে দু’টি চর্যাপদের শ্লোক এবং একটি চর্যার-পরেরকার-সময়ের-হলেও-হতে-পারে শ্লোক রয়েছে। চর্যার শ্লোকদু’টি আমারই লেখা, ওই একই স্টাইল কপি করে। পরেরটি লিখে দিয়েছেন অগ্রজ প্রাবন্ধিক শ্রীরজতকান্তি পাল মহাশয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সাপ্লাই দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রাজা ভট্টাচার্য।

আপাতত এইটুকুই রইল। পাঠক পড়ে দেখবেন আশা করি। ভালো লাগলে জানাবেন। আর খারাপ লাগলে চ্যালাকাঠখানি পিঠে থোড়াসা মিঠে করে ভাঙবেন… এই আর কী!

অভীক সরকার

চক্রসম্বরের পুঁথি



সেবারে পুজোয় ষষ্ঠীর দিনই একপশলা ঝড়বৃষ্টি হয়ে পুজোর প্রায় দফারফা। আমাদের সবারই তো মাথায় হাত। বছরে এই একটামাত্র সময়েই নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে একটু ফূর্তিফার্তা করার পারমিশন থাকে। সে-সব ভেস্তে গেলে কারই বা আনন্দ হয়? তা বাড়িতে বসে-থেকে-থেকে বেজায় মন খারাপ, মায়ের হাতের অমন চমৎকার পরোটা আর ঘুগনি অবধি পানসে লাগছে, এমন সময় তাপসের ফোন।

তাপস হচ্ছে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের বন্ধু। আমি তখন আশুতোষ কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, ফিজিক্স অনার্স। কোনও একটা কলেজ ফেস্টেই আমার আলাপ তাপসের সঙ্গে, সে-আলাপ বন্ধুত্বে গড়াতে দেরি হয়নি বেশি। ছোটখাটো চেহারার হাসিখুশি ছেলে ছিল তাপস, পড়াশুনোয় তুখোড়। অঙ্কে পরিষ্কার মাথা, ধাঁধা আর রুবিক কিউব সলভ করত প্রায় তুড়ি মেরে। নানা ধরনের তাসের ম্যাজিকও দেখাত চমৎকার।

সে যা-ই হোক, পরের দিন সকালে তাপস এসে হাজির। মা তো তাপসকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনিও অনেকদিন পর ওকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি। একগাদা কুশল মঙ্গল ইত্যাদির পর সে ছোকরা সোফায় একটু থিতু হয়ে বসতেই প্রশ্ন করলাম, “বল ভাই, কী ব্যাপার। কাল তো তোর ফোন শুনে কিছুই বুঝলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম, কী-একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চাই তোর। এবার বল তো, তোর মতো এমন চৌখস ছেলের আবার আমার সাহায্য দরকার পড়ল কেন?”

জবাবে তাপস যেটা বলল সেটা যেমনই অদ্ভুত, তেমনই আশ্চর্যজনক।

তাপসের এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠা থাকতেন দার্জিলিংয়ে। রক্তের সম্পর্কের কেউ না, তাপসের বাবার গ্রামতুতো দাদা। কলকাতার কোনও একটা বয়েজ স্কুলের হিস্ট্রির টিচার ছিলেন এককালে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর অগাধ জ্ঞান। বিদেশের কোনও জার্নালে নাকি পেপার-টেপারও বেরিয়েছিল এক-দু’বার। ভদ্রলোকের তিনকূলে কেউ নেই, বিয়েশাদির ঝামেলায় যাননি, বুড়ি মা-কে নিয়ে কাঁকুড়গাছির কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্টে একাই থাকতেন। তাপসের বাবা তাঁর এই আধপাগল গ্রামতুতো দাদাকে একটু শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বাড়িতে প্রায়ই যাওয়া-আসা ছিল। সেই সূত্রে উনি তাপসকে ভাইপো বলতেন, তাপসও চিরকাল ওঁকে নারানজ্যেঠু বলে ডেকে এসেছে।

মা মারা যাওয়ার পর পরই কেমন যেন বিবাগী হয়ে যান মানুষটা, তাপসের ভাষায় ন্যালাখ্যাপা। হুট করে চাকরিটা ছেড়ে দেন, তখনও ওঁর রিটায়ার করতে বছর-দশেক বাকি। এককালের ডাকসাইটে নাস্তিক ভদ্রলোক নাকি তখন প্রায়ই বেনারস, কাঞ্চী, কামাখ্যা, কেদারনাথ এ-সব করে বেড়াতেন। শেষদিকটায় নাকি তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির দিকেও ঝুঁকেছিলেন। তা-ও আবার দেশি কিছু না, খাস টিবেটান তান্ত্রিক পদ্ধতি! ভদ্রলোক শেষমেশ বছর-সাতেক আগে হঠাৎ করে কলকাতার বাড়িটাড়ি বেচে দিয়ে দার্জিলিংয়ে গিয়ে থিতু হন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা অনেক মানা করেছিলেন বটে, কিন্তু শোনেননি। সেই যে গেলেন, তারপর থেকে নো খবর, নো পাত্তা। মাঝে-মাঝে এই তাপসই দেখতে যেত তার জ্যেঠুকে, ওর সঙ্গেই যা-একটু যোগাযোগ ছিল ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক নিজেও দেশের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। ফলে যা হয় আর কী, লোকে মোটামুটি ভুলেই গিয়েছিল নরনারায়ণ ভট্টাচার্যকে।

তাপস বলল গতকাল সকালে নাকি ভদ্রলোক তাপসকে ফোন করেন। এবং ‘হ্যালো’ বলার পরেই নাকি নরনারায়ণবাবু ওকে আর বেশি কিছু বলার সুযোগ দেননি, কোনও ভণিতা না করে বলেন যে উনি একটা বিপদের আঁচ পাচ্ছেন। তাপস পারলে যেন চট করে একবার দার্জিলিংয়ে চলে আসে।

তাপস ভারি আশ্চর্য হয়েছে। কারণ নারানজ্যেঠু এমনিতে যেমন ধীরস্থির, আবার দরকার পড়লে তেমনই ডেয়ারডেভিল গোছের লোক। দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আর মূর্তির খোঁজে কাঁহা-কাঁহা-মুল্লুক চলে যেতেন একাই।

একবার খিদিরপুর না রাজাবাজার কোথায় যেন গুন্ডারা কোনও একটা দামি মুদ্রার খোঁজে তাঁর ওপর হামলা করে। ব্যাটাচ্ছেলেগুলো বিশেষ সুবিধা তো করতে পারেইনি, উল্টে নারানজ্যেঠুই ইট মেরে দুটোর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। এ-হেন শক্তপোক্ত লোকই ফোন করে বিপদের তার সাহায্য চাইছেন দেখে ভারি অবাক হয়েছে সে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বিপদটা কী-রকম আর কীসের সাহায্য চাইছেন উনি সেটা বলেছেন?"

তাপস জানায় যে পুরোটা খুলে বলেননি না জ্যেঠু। শুধু বোঝা গেছে যে তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর প্রাণ বেজায় বিপন্ন, কেউ বা কারা জ্যেঠুর পেছনে নাকি উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা নাকি খুবই সাঙ্ঘাতিক মানুষ, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দু-চারটে খুন জখম করা ওদের পক্ষে জলভাত। নারানজ্যেঠু এ-ও বলেন যে তিনি মরতে ভয় পান না। কিন্তু দৈবাৎ তাঁর হাতে এমন একটা জিনিস এসেছে যার ঐতিহাসিক মূল্য অসীম, টাকাকড়িতে তার পরিমাপ হওয়া সম্ভব নয়। যারা জ্যেঠুর পেছনে পড়েছে তারা চায় এটা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায়, তাতে ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা হারিয়ে গেলে নাকি বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর সেটা জ্যেঠু কিছুতেই হতে দিতে পারেন না।

শুনে বেশ খানিকটা চুপ করে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, "আর কী বললেন জ্যেঠু?"

তাপস বলল যে অনেক প্রশ্ন করতেও আর কিছুই ভেঙে বলেননি তিনি। শুধু বলেছেন "আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে যা তাপস। আমি জায়গা বলে দেব, যে-করে-হোক সেখানে এটা পৌঁছে দিস, ব্যস। তাহলেই তোর ছুটি। তারপর আমি মরি বা বাঁচি, তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না।" এর বাইরে নারানজ্যেঠু আর একটাও বেশি কথা বলেননি।

শুনে আমি আর তাপস দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপটি করে বসে রইলাম। কাজটা যে ঝুঁকির তাতে সন্দেহ নেই। এদিকে কৌতূহলও হচ্ছে বিস্তর। এ-রকম ছোটখাটো দু-একটা অ্যাডভেঞ্চার ততদিনে আমরা করে ফেলেছি অলরেডি।

তবে এ-সব হচ্ছে আজ থেকে বছর কুড়ি-বাইশ আগেকার কথা। গ্র্যাজুয়েশন করে বাড়িতে বসে আছি আর বাপ-মায়ের অন্ন ধ্বংস করছি। তখন আমাদের বয়েস অল্প, বুকে দুর্জয় সাহস। তার ওপর নিয়মিত জিম করতাম, মার্শাল আর্টও শেখা ছিল অল্প-স্বল্প। মুশকিল হচ্ছে মা-কে নিয়ে, এ-সব ঝামেলার কথা খুলে বললে আমাকে তো যেতে দেবেনই না, তার ওপর তাপসের যাওয়াটাও পাক্কা ভন্ডুল করে দেবেন।

ফলে স্থির হল দু'জনের কারও বাড়িতে কিচ্ছুটি খুলে বলা চলবে না। নারানজ্যেঠু বহুদিন বাদে তাপসকে দেখতে চেয়েছেন, এই বলে চুপচাপ কেটে পড়তে হবে। আমিও যে যাচ্ছি সে-কথাটাও জানিয়ে দেওয়া হবে জ্যেঠুকে।

সেই প্ল্যানমাফিক দু'জনের বাড়িতেই আর্জি পেশ করা হল। আবেদন মঞ্জুরও হয়ে গেল ঝটপট। তাপসের বাবা তো বলেই দিলেন, আমরা যেন জ্যেঠুকে আরেকবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে দার্জিলিংয়ের পাট গুটিয়ে কলকাতায় চলে আসার কথাটা বলি, "একলা মানুষ। কবে কোথায় মরে-টরে পড়ে থাকবে সে-খবরও পাব না। এখানে থাকলে অন্তত দেখাশোনাটা হবে।"

তখনকার দিনে টিকিট বুকিং করায় বিস্তর হ্যাপা ছিল। তখন পুজোর ছুটি পড়েছে, উত্তরবঙ্গের যে-কোনও ট্রেনে জায়গা পাওয়া আর ভগবানের দেখা পাওয়া একই ব্যাপার। বাঁচোয়া এই যে তাপসের কোন এক কাকা রেলওয়েতে কাজ করতেন, শেষমেশ তাঁকেই অনেক ধরে-কয়ে কোনওমতে দার্জিলিং মেলের স্লিপার ক্লাসের দুটো টিকিট ম্যানেজ করা হল। আমরাও দু'জনে দুগ্গা-দুগ্গা বলে রওনা দিলাম।

যেদিন রওনা দিলাম সেটা ছিল বুধবার। নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছোলাম বিষ্যুদবারদিন সকালে। পাহাড়ে যেতে গেলে অনেকে স্টেশন থেকেই গাড়ি নিয়ে নেন। আমরা কিন্তু ওদিকে গেলাম না, ধীরেসুস্থে স্টেশনের কাছে একটা ছোট হোটেলে উঠলাম প্রথমে। একটা কারণ যদি হয় যে তখন অলরেডি পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে, তো আরেকটা হল যে আমাদের কেনাকাটিও বাকি ছিল কিছু। হোটেলে ধীরে-সুস্থে স্নান খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর সবকিছু মিটিয়ে-টিটিয়ে যখন জগবাহাদুরের চেনা জিপে চড়ে দার্জিলিংয়ের দিকে রওনা দিলাম তখন বাজে ঠিক দুপুর দুটো।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে হলে কার্শিয়াং হয়ে পাংখাবাড়ির রুটটাই বেটার, এতে টাইম কম লাগে, তার ওপর সিনিক বিউটিও দুর্দান্ত। কিন্তু জগবাহাদুর বলল ওদিকে কী-একটা গড়বড় হয়েছে, রোহিনী টি-গার্ডেন থেকে মস্ত জ্যাম। অগত্যা সেবক হয়ে যাওয়াটাই ঠিক হল। আর সেইখান থেকেই বুঝতে পারলাম কিছু একটা গন্ডগোল আছে।

আমাদের জিপটা সবে করোনেশন ব্রিজ ডাইনে ফেলে কালীঝোরার দিকে একটু এগিয়েছে, এমন সময় একটা হেয়ার-পিন বেন্ড ঘুরেই দেখি রাস্তার ওপর এক ভদ্রলোক অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে রাখা মস্ত রুকস্যাক, আর আমাদের দিকে দু'হাত তুলে নাড়াচ্ছেন। ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট, ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন, আর আমাদের সাহায্য চান।

পাহাড়ের অলিখিত আইন হচ্ছে রাস্তায় বিপন্ন মানুষ দেখলেই হেল্প করা। জগবাহাদুরও তাই ভদ্রলোক যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার সামনে গাড়িটাকে আস্তে করে সাইড করে রাখল।

আমরা নামতেই ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন প্রায়। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন, "সো কাইন্ড অফ ইউ। এই দেখুন না, শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি দার্জিলিং, মাঝখানে গাড়ি খারাপ হয়ে কী গেরো! সে তো কোনওরকমে সেবকে নেমে গেছে গাড়ি সারাই করাতে, আসার আর নামই নেই। সেই থেকে ঘণ্টা-দুয়েক ধরে..."

এত বলার দরকার ছিল না। তাপসই মিষ্টি হেসে বলল, "আরে ঠিক আছে, উঠে আসুন। ড্রাইভারের পাশের সিট ফাঁকাই আছে।" উনিও অমনি দিব্যি থ্যাঙ্কিউ-ট্যাঙ্কিউ বলে গাড়িতে উঠে পড়লেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, "অনেক ধন্যবাদ ভাই। খুব উপকার করলেন। আপনারা না এলে যে কী আতান্তরেই পড়তুম। আজকাল আর এমন পরোপাকারী লোকজনের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম দেবাশিস বণিক, বাড়ি ভবানীপুরে।"

আমরাও আমাদের পরিচয়-টরিচয় দিলাম। কথায়-কথায় জানা গেল দেবাশিসবাবু ধর্মতলায় একটা কিউরিওশপ চালান, বাড়িতে বউ আছে, আর আছে একটি ছোট মেয়ে, বয়েস পাঁচ। মাঝে-সাঝেই এদিকে আসতে হয়, "চেনা গাড়ি ভাই, বরাবর ঠিকঠাক পৌঁছে দিয়েছে। এবারেই যে কী হল।" আক্ষেপ করছিলেন ভদ্রলোক।

গাড়িটা মংপো-র কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে গিয়ে থামতে সবাই নেমে একবার হাত-পা ছাড়িয়ে নিলাম। তাপস বলল এই রাস্তা দিয়ে গেলে নাকি এই দোকানে ম্যাগি আর চা খাওয়াটা মাস্ট। দাম অবশ্য দেবাশিসবাবুই দিলেন, আমরা পয়সা বের করতেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ভদ্রলোক, "তোমরা আমার যে-উপকার করলে ভাই তার তুলনা নেই, অন্তত চা আর ম্যাগিটা খাওয়াতে দাও।"

দার্জিলিং পৌঁছোতে-পৌঁছোতে প্রায় সাতটা বাজল। পাহাড়ি এলাকায় তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। দেবাশিসবাবুকে নামিয়ে দিলাম ম্যাল-এর সামনেটায়। উনি ফের একপ্রস্থ ধন্যবাদ-টন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন, "হোটেল হিমালয়ান রিট্রিটে উঠেছি ভায়া। দিন চারেক আছি। এদিকে এলে একবার দর্শন দিয়ো।" বলে রুকস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে ম্যালের দিকে উঠে গেলেন ভদ্রলোক।

একবার তাপসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর কপালে গভীর ভ্রূকুটি, কী যেন একটা ভাবছে মন দিয়ে। একবার ঠেলা দিলাম ওকে, "কী রে, কী ভাবছিস?" আমার দিকে একবার অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েই ঝাড়া দিয়ে উঠল ও, "না কিছু না, চ' চ' লেট হয়ে যাচ্ছে।"

*

"এইবার বলুন তো জ্যেঠু, কেসটা কী। সেদিন ফোনে কী যে বললেন তার কিছুই বুঝলাম না।"

কথাটা হচ্ছিল পরেরদিন সকালে। আমরা চারজন, অর্থাৎ আমি, তাপস, ইন্সপেক্টর গুরুং আর নারানজ্যেঠু চা খেতে বসেছি জ্যেঠুর বাংলোর দোতলায়। দোতলার আর্ধেকটা খোলা ছাদ, বাকি আর্ধেকটায় জ্যেঠুর স্টাডি কাম লাইব্রেরি। আমরা সকালেই একপ্রস্থ ঘুরে এসেছি লাইব্রেরি থেকে। কম-সে-কম হাজার দশেক বইয়ের সম্ভার, তার বেশিরভাগই বই-ই আবার বাংলা ভাষার আর সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস নিয়েও বেশ কিছু বই দেখলাম। বৌদ্ধধর্মের ওপর বই তো অগুনতি!

আমরা বসেছি চা গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি একটা চমৎকার টি-টেবিল ঘিরে। আশ্বিনের সকাল, হাওয়ায় শীতের কামড় যথেষ্টই। আমার আর তাপসের গায়ে মোটা গরম-পোশাক। আমাদের চারজনের সামনেই ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ, তার গন্ধেই মাত হয়ে যেতে হয়, স্বাদের তো কথাই নেই। পরে জেনেছিলাম ওটা নাকি গোপালধারা টি-এস্টেটের চা।

জ্যেঠুর বাংলোটা ঠিক দার্জিলিংয়ে নয়, একটু দূরে, লেবং-এ। তবে দার্জিলিং থেকে দূরে হলে কী হবে, জায়গাটা যে জ্যেঠু জব্বর বেছেছেন তা মানতেই হবে। সামনের দিকে সোজা তাকালে পাহাড়ের শ্রেণী। কলকাতায় এখন বৃষ্টি হলেও এদিকে দিব্যি ঝকঝকে আকাশ। চুড়োগুলো একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরে ওদের নামও জেনেছিলাম জ্যেঠুর কাছে, জানু, কাবরু, পান্ডিম, আর অফ কোর্স, দ্য গ্রেট কাঞ্চনজঙ্ঘা।

একটু নীচের দিকে তাকালে আবার লেবং রেসকোর্স -গোটা নর্থ বেঙ্গলে একমাত্র ঘোড়দৌড়ের জায়গা। জ্যেঠুর বাংলোর পাশ থেকে পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে নীচের দিকে,তার গা বেয়ে ঘন জঙ্গল, আর উঁচু-উঁচু গাছের বাহার। ঢালের গায়ে ছোট-ছোট চা বাগান, বাগানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা, রুপোলি ফিতের মতো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে সমতলের দিকে। ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ালে নীচের দিকে আরও একটা গ্রাম চোখে পড়ে, জ্যেঠু বললেন ওটার নাম হরসিং হাট্টা।

জ্যেঠুর সঙ্গে আলাপটা অবশ্য আজ সকালেই হল। কারণ কাল রাতে যখন বাংলোয় পৌঁছোই, তখন বাজে প্রায় আটটা। যে ছেলেটা দরজা খুলে দিল তার নাম লোবসাম। জ্যেঠু তখন জেগে ছিলেন না, ডাক্তারের নির্দেশে ওঁকে সাতটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হয়। লোবসামই আমাদের ঘর-টর দেখিয়ে ডিনারের ব্যবস্থা করে দেয়।

জ্যেঠু মাথা নিচু করে চায়ের কাপে চামচ নাড়াচাড়া করছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মাঝারি হাইট, হলদেটে ফর্সা রঙ আর একমাথা কাঁচাপাকা চুল, যাকে ইংরেজিতে বলে সল্ট অ্যান্ড পেপার। জ্যেঠুর পাশের চেয়ারে বসেছিলেন ইন্সপেক্টর গুরুং। ইনি হলেন গিয়ে দার্জিলিং থানার অফিসার-ইন-চার্জ, অর্থাৎ দারোগাবাবু। অবশ্য দারোগাবাবু বলতেই যে পেটমোটা গুঁফো চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে এঁর কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন চমৎকার পেটাই চেহারা, তেমনই সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। তার ওপর এঁর পড়াশোনাটাও আবার কলকাতাতেই, তাই বাংলাটাও মাতৃভাষার মতই ঝরঝরে বলেন তিনি। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন মিস্টার গুরুং, "হ্যাঁ মাস্টারসা'ব, আপনি ব্যাপারটা এবার খুলে বলুন তো। এত জরুরি এত্তেলা কীসের?"

জবাবে জ্যেঠু কিছু বললেন না, শুধু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে, ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। আমরা তিনজনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

একটা হলদে রঙের তুলোট কাগজ। দেখলেই বোঝা যায় যে তার বয়েস হয়েছে। তুলোট কাগজ সেকালেও খুব একটা চট করে পাওয়া যেত না, এখন তো বোধহয় আরও দুষ্প্রাপ্য। তার চারটে কোনায় চারটে অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা, আর মাঝখানে লাল রঙের কালিতে লেখা চার লাইনের একটা কবিতা। মুশকিল হচ্ছে যে, কবিতাটা বাংলা অক্ষরে লেখা বটে, কিন্তু ভাষাটা এক্কেবারে অচেনা, পড়ে কিছুই বুঝলাম না। লেখাটা এরকম,

মোহেরা মাআজলঅ বান্ধএ পয়গম।
চৌদীস চ্ছড্ডু থাবর জঁগম।
ণাএ যো ভতারি ন সো সুবনকেড়ুয়াল।
অবেজ্জসূ কুম্ভীরে লুড়িউ আলাজাল।
দুহিলা দুধলপ্রভা সামায় উজুবাটে,
অটমহাসিদ্ধ মআকাল কাটে।

তিনজনেই হতবুদ্ধি হয়ে জ্যেঠুর দিকে তাকালাম। প্রথম প্রশ্নটা তাপসই করল, “এ আবার কোন ভাষা? মানে লিপিটা তো বাংলাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এর তো মানেই বুঝতে পারছি না।”

ইন্সপেক্টর গুরুং খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কাগজটার দিকে, কাগজটা হাতে তুলে নাকের কাছে নিয়ে এসে কী-একটা শুঁকলেন। তারপর ওটা নামিয়ে রেখে ভুরুটুরু কুঁচকে বললেন, “এটা কোথায় পেলেন আপনি?”

“গত শনিবার মর্নিং ওয়াকের জন্য দরজা খুলে বেরোতে যাব, দেখি লেটারবক্সে একটা বড় সাদা খাম। খামের ওপর কোনও নাম ঠিকানা কিচ্ছু নেই। ডাকঘরের সিল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। খাম ছিঁড়ে দেখি এই চিঠি।”

“কিন্তু জ্যেঠু, চিঠিটার তো কোনও মানেই বুঝতে পারছি না। কী ভাষা এটা?” প্রশ্ন করলাম আমি।

“বাংলা।” জ্যেঠুর উত্তর।

“অসম্ভব। এটা বাংলা হতেই পারে না।” চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে বলল তাপস।

জ্যেঠু কিছু বলার আগেই প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর গুরুং, “কিন্তু মাস্টারসা’ব, একটা কথা বলুন, আপনি বলছেন এ-সব নাকি থ্রেটনিং লেটার। কিন্তু আপনাকে অদ্ভুত ল্যাঙ্গুয়েজে থ্রেট দিয়ে এ-সব চিঠি-ফিঠি কে পাঠাবে? না আপনি কোনও বড় বিজনেসম্যান, না আপনি কোনও খাজানার মালিক হয়ে বসেছেন। তাহলে আপনাকে থ্রেট দিয়ে লাভ? এ-সব কোনও লোক্যাল ছেলে-ছোকরার কীর্তিকলাপ নয় তো?”

“না হে গুরুং, এ কোনও লোক্যাল ফচকে ছোঁড়ার কীর্তি নয়।” গম্ভীরমুখে বললেন জ্যেঠু, “তার কারণ দুটো। এক, এখানকার ছেলেমেয়েরা আমাকে কতটা ভালোবাসে সে তুমিও ভালো করেই জানো। আর দ্বিতীয় কারণটাই মোক্ষম। আজকের যুগে এই ভাষায় অরিজিনাল দুটো লাইন লেখার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে।”

ইন্সপেক্টর সাহেবের মুখ দেখে মনে হল কথাটা ঠিক ওঁর মনঃপূত হল না। চিঠিটা ফেরত দিয়ে চায়ের কাপটা এক চুমুকে শেষ করে বললেন, “দেখুন মাস্টারসা’ব, আমার মতে সে-রকম চিন্তার কিছু নেই। মনে হচ্ছে কোনও কারণে কেউ একজন প্র্যাংক করেছে আপনার সঙ্গে। তবুও সাবধানের মার নেই, আমি বরং

একটা কনস্টেবলকে বলছি আপনার বাড়ি দু'বেলা খোঁজ নিয়ে যাবে। আমার মত হচ্ছে কয়েকটা দিন সাবধানে থাকুন। থানা আর আমার বাড়ি, দুটো ফোন নাম্বারই আপনার কাছে আছে। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটতে দেখলে আমাকে ফোন করবেন, কেমন?" বলে কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে চলে গেলেন ভদ্রলোক। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় জুতোর 'ঠক ঠক' আওয়াজ উঠে এল।

তাপস এতক্ষণ কাগজের টুকরোটাকে খুব মন দিয়ে দেখছিল। বলা ভালো চার কোণে আঁকা চারটে অদ্ভুত চিহ্নকে। এবার সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল জ্যেঠুকে, "এবার বলো তো জ্যেঠু এটা কোন ভাষা? আর লেখাটার মানেটাই বা কী?"

"বললাম তো, বাংলা ভাষা। আর ওখানে যা লেখা আছে তার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, মোহের মায়াজালে বদ্ধ পতঙ্গকে একদিন তার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে যেতে হয়। নৌকায় যার অধিকার নেই, তার হাতে এসেছে সোনার দাঁড়, তাই অবিদ্যারূপী কুমির এসেছে সব তছনছ করে লুটে নিতে। বরং দুইয়ে নেওয়া দুধও উলটো পথে বইতে পারে, কিন্তু মহাকালরূপী অষ্টমহাসিদ্ধ-র হাত থেকে তার রক্ষা নেই।"

আমি আর তাপস অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলাম জ্যেঠুর দিকে। জ্যেঠু বোধহয় আমাদের মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। তারপর বললেন, "বুঝতে পারলি না, তাই তো? উচ্চমাধ্যমিকের বাংলার সেকেন্ড পেপারটা যে দু'জনের কেউ-ই মন দিয়ে পড়িসনি সেটা বুঝতে পারছি। বলি চর্যাপদ বলে কোনও বই বা পুঁথির নাম মনে পড়ছে?"

শুনে প্রমাদ গণলাম। এইচ এস-এ বাংলার সেকেন্ড পেপারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছিল বটে, অসিতকুমার বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের একটা গাবদা বইয়ের কথাও আবছাভাবে মনে পড়ল। সেখানেই চর্যাপদ বলে কিছু একটার কথা পড়েছিলাম বোধহয়। কিন্তু সে-বেড়া বহু কষ্টে টপকেছি, এখন কি আর সে-সব কিছু মনে থাকে?

জ্যেঠু আমার মুখ দেখে চুক-চুক আওয়াজ করে বললেন, "বাঙালি হয়েও যে আমরা বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানি না, এটা আমাদের পক্ষে খুবই লজ্জার বিষয়। সে যা হোক, ছোট করেই বলি, চর্যাপদ হচ্ছে একটা পুঁথির নাম। বাংলা ভাষাতেই লেখা বটে, কিন্তু এ হচ্ছে বাংলার আদিতম রূপ। এখন আমরা বাংলা ভাষা যে-ভাবে দেখি, বা বলি, বা লিখি, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই।"

"ইয়েস, চর্যাপদ। বাংলা ভাষায় ছাপা প্রথম বই।" প্রায় লাফিয়ে উঠল তাপস, "মনে পড়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল বা ভুটানের রাজার গোয়ালঘর থেকে এ-বই উদ্ধার করেছিলেন। এইবার মনে পড়েছে।"

"প্রথম ছাপা বই না, বাংলা ভাষার ওল্ডেস্ট যে ফর্ম, সেই ফর্মে লেখা বই।" কেটে-কেটে বললেন নারাণজ্যেঠু, "আর গোয়ালঘরে না, খুঁজে পাওয়া গেছিল নেপালের রাজপরিবারের লাইব্রেরিতে। যিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর নামটা অবশ্য ঠিকই বলেছিস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর দৌলতেই আমরা বাংলার আদিযুগের অনেক কথা জানতে পেরেছি। নমস্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন হরপ্রসাদ। শুধু বাংলার ইতিহাস না, পুরো বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ওপরেই একজন অথরিটি।"

আলোচনাটা ক্রমেই অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমিই বাধ্য হয়ে রাশ টেনে ধরলাম, "কিন্তু আসল কথাটা যে চাপা পড়ে গেল জ্যেঠু! লেখাটার মাথামুন্ডু যে কিছুই বুঝলাম না। আর তাতে করে আপনাকে কী করে ধমকি দেওয়া হচ্ছে সেটাও তো বুঝলাম না।"

"বুঝলি না, তাই তো? আসলে ওটার আক্ষরিক অর্থ আর প্রকৃত অর্থের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। পড়ে যা বুঝছিস, তার একটা মানে তো আছেই, সে যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। তবে আসল মানেটা পাবি ওই প্রকৃত অর্থের মধ্যেই। সেটা বোঝা অবশ্য একটু ডিফিকাল্ট।"

"কেন জ্যেঠু?" প্রশ্ন করলাম আমি। ব্যাপারটা বেশ জটিল লাগছিল আমার কাছে।

"কারণ ওটাই চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য।" ক্লাস নেওয়ার ঢংয়ে বলতে শুরু করলেন জ্যেঠু, "চর্যাপদ যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের একটা আলাদা শাখার সাধক ছিলেন, যাকে বলে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম। তোরা নিশ্চয়ই জানিস যে, বুদ্ধদেব মারা যাওয়ার কয়েকশো বছরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম হীনযান আর মহাযান, এই দুইভাগে ভেঙে গেছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের শেষ দিকে একটা শাখা জন্মায়, নাম বজ্রযান। যান শব্দটার অর্থ পথ, বা রাস্তা। আজকে আমরা তান্ত্রিক বুদ্ধিজম বলতে আমরা যা-যা বুঝি, তার সবই এই বজ্রযানী বৌদ্ধদের কল্যাণে প্রাপ্ত।"

একনাগাড়ে এতটা বলে জ্যেঠু একটু থামতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাপস, "হ্যাঁ-হ্যাঁ- ওই তারা, বজ্রযোগিনী, যমন্তক..."

"যমন্তক না, যমান্তক।" একটু কড়া গলায় বললেন জ্যেঠু, "যমের অন্ত করেন যিনি, তিনি যমান্তক। আর হ্যাঁ, এ-সবই বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবদেবী। এই বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম থেকে আসে সহজিয়া বৌদ্ধমত। আর সেটার জন্ম এই বাংলাদেশেই।"

"কিন্তু তার সঙ্গে এই চিঠির কী সম্পর্ক?" প্রশ্নটা আমিই করলাম, "আর ওই গোলমেলে আসল মানে, আক্ষরিক মানে, এ-সব আবার কী?"

"এ-সব যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া মতে সাধনা-টাধনা করতেন। তাঁরা চাইতেন যে, যাঁরা এই সাধনবিদ্যার অধিকারী, একমাত্র তাঁরাই যেন এ-সব জটিল পদের মানে বোঝেন। তাই তাঁরা এ-রকম হেঁয়ালিভরা ভাষায়, মানে এই একই বাক্যের দু'ধরনের মানে আছে এমন ভাষায় দোঁহা লিখে গেছেন। মানে পদকর্তা বলেই দিচ্ছেন যে যদি তুমি এ-পথের পথিক না হও, তাহলে তফাৎ যাও, এ-রাস্তা তোমার নয়।"

তাপস প্রশ্ন করল, "তার মানে এই যে চিঠিটা আপনাকে লেখা হয়েছে, তার ওই পতঙ্গ, কুমির, উজুবাট না কী-সব যেন বললেন, তার একটা অন্য মানেও আছে?"

"আছেই তো।"

"কী সেটা?"

"এখানে বলা হচ্ছে আমি লোভে পড়ে এমন একটা জিনিস দখল করেছি যার ওপর আমার কোনও অধিকার নেই। সেটাকে সুবনকেড়ুয়াল, অর্থাৎ সোনার দাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই অবিদ্যারূপী কুমির অর্থাৎ কোনও খতরনাক ক্রিমিনাল লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ওপর আক্রমণ করার প্রতীক্ষায় আছে। এর কোনও প্রতিকার নেই। কারণ দুইয়ে নেওয়া দুধের উল্টোপথে বয়ে যাওয়া যেমন অসম্ভব, অষ্টমহাসিদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও তেমনই অসম্ভব ।"

শুনে দু'জনেরই ভারি আশ্চর্য লাগল। আমি কী-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই লোবসাম এসে বলল, "দত্তশাব আয়ে হ্যাঁয়।" শুনে নারানজ্যেঠু শশব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন।

*

"আমি তো তোমাকে সেদিনই বলেছিলাম নারান, এ-জিনিস হাতের কাছে রেখো না। তোমার উচিত ছিল এটা হাতে পাওয়ামাত্র ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির মতো কোনও সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা। তাহলে এত হ্যাঙ্গাম হতই না। তুমি তো আবার আমার কথা কানে তোলার প্রয়োজনই বোধ করো না।" দত্তবাবুর গলার স্বরে গমগম করছিল জায়গাটা।

আমরা হাঁ-করে চেয়ে ছিলাম ভদ্রলোকের দিকে। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অমন সুপুরুষ আজকাল চট করে দেখাই যায় না। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি হাইট, শরীরে সামান্য মেদ। কাশীর পেয়ারার মতো গায়ের রঙ,

চোখা নাক আর গমগমে গলার আওয়াজে লোকটার ব্যক্তিত্ব জিনিসটা যেন আরও খোলতাই হয়েছে। তাছাড়া ভদ্রলোকের যে পয়সা আছে সেটা গায়ে চড়ানো বিদেশি পুলোভারেই মালুম দিচ্ছে।

দত্তবাবুর পরিচয়টা অবশ্য নারানজ্যেঠু বিশদেই দিয়েছিলেন আমাদের। উনি একজন রিটায়ার্ড সরকারি আমলা। কুচবিহারের লোক, বাবা ছিলেন রাজপরিবারের ম্যানেজার। দাপটে কাজ করেছেন সারা জীবন, "কোনওদিন অন্যায়ের সামনে মাথা নোয়াইনি হে। মাথা উঁচু করে কাজে ঢুকেছিলাম, মাথা উঁচু করে বেরিয়েছি।" গর্ব করে বলছিলেন ভদ্রলোক। এখন রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছেন বাংলার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে। মাস-তিনেক হল এখানে এসেছেন, ভাবছেন এখানেই একটা বাড়ি কিনে থিতু হবেন। এর মধ্যেই জ্যেঠুর সঙ্গে হেব্বি দোস্তি হয়ে গেছে ভদ্রলোকের।

নারানজ্যেঠু অল্প হেসে বললেন, "আপনি তো জানেন দত্তদা, এই বিষয়টা আমার কাছে কতটা মূল্যবান। এমন একটা জিনিস হাতে এল, নিজে একটু নেড়ে-ঘেঁটে দেখব না?"

"দ্যাখো নারান, এ-সব ছেলে-ভুলোনো কথা আমাকে বোঝাতে আসবে না।" উত্তেজিত হয়ে পড়লেন দত্তসাহেব, "বরং স্বীকার করো যে এটা নিয়ে একটা পেপার-টেপার লিখে ঐতিহাসিক মহলে একটা হইচই লাগিয়ে দেবে, লোকে তোমাকে দ্বিতীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলে ডাকবে, সেইটেই তোমার মনের ইচ্ছে। খ্যাতি, স্রেফ খ্যাতির লোভেই এতবড় রিস্কটা নিচ্ছ তুমি।"

হালকা হাসলেন জ্যেঠু, "এই শেষ বয়সে এসে যদি একটু খ্যাতির লোভ হয়েই থাকে, তাহলে সেটা কি খুব অন্যায় হবে দাদা? আপনি তো জানেন যে এই কাজেই আমি আমার সারাটা জীবন ব্যয় করেছি। এখন যদি বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ইতিহাসে হই-হই ফেলে দেওয়ার মতো কিছু পেয়েই থাকি, তার দৌলতে কিছু খ্যাতি তো আমারও প্রাপ্য হয় দত্তদা।"

"তা সে-বস্তুটি এখনও বাড়িতেই আছে না অন্য কোথাও রেখেছ?"

কাষ্ঠহাসি হাসলেন নারানজ্যেঠু "প্রত্যেকবার এইটে জিজ্ঞেস করে কেন আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলেন দাদা? আপনি তো জানেন পুঁথিটা কোথায় রেখেছি সেটা আমি আপনাকে কেন, কাউকেই বলব না। আপনি কী ভাবছেন, যারা আমার ওপর নজর রাখছে তারা কি আর আপনার ওপরেও স্পাই লাগায়নি? কাল যদি তারা পুঁথিটার খোঁজে আপনাকে পাকড়াও করে? না দাদা, আপনি বুড়ো মানুষ, এ-সব খবর জানিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলার কোনও বাসনাই আমার নেই। তাছাড়া ওটা আমার লাইফ ইনশিওরেন্সও বটে। যতক্ষণ আমার কাছে গচ্ছিত আছে, ততক্ষণ আমি নিরাপদ। ওরা আমার কোনও অনিষ্ট করার আগে দশবার ভাববে। কিন্তু কোথায় আছে সেটা জানিয়ে আমি আর আপনাকে বিপদে ফেলতে পারলাম না, সরি।"

দত্তসাহেব গলার মধ্যে একটা 'ঘোঁত' শব্দ করে অপ্রসন্ন মুখে চুপ করলেন।

এইখানে আমি প্রশ্ন করলাম, "সকাল থেকে তো অনেক কিছুই শুনলাম জ্যেঠু। কিন্তু জিনিসটা যে কী সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

নারানজ্যেঠু তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর সামান্য চাপা গলায় বললেন, "পুঁথি, একটা প্রাচীন পুঁথি। নাম চক্রসম্বরধ্যানমালা।"

"কী? কোন ফুলের মালা?" আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম নামটা শুনে। প্রশ্নটা অবশ্য তাপসেরই।

"চক্র-সম্বর-ধ্যান-মালা।" কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন নারানজ্যেঠু, কঠিনস্বরে বললেন "ফুলের মালা নয় তপু।"

"বাপ রে, কী-সব নাম। কীসের পুঁথি এটা, যার জন্য আপনাকে খুনের হুমকি পেতে হচ্ছে?"

এবার উত্তরটা দিলেন দত্তসাহেব, "তার কারণ অনেক জটিল হে। এই পুঁথি মহামূল্যবান, টাকায় এর ভ্যালু পরিমাপ করা যাবে না। যে কোনও ইতিহাসবিদ এর খোঁজ পেলে স্রেফ আনন্দেই পাগল হয়ে যাবে। আর

ইতিহাস বলতে শুধু বাংলা ভাষার ইতিহাস না, বৌদ্ধধর্মের যে বজ্রযান নামের একটা তান্ত্রিক শাখা আছে সেটা জানো তো? তার ইতিহাসেও এই পুঁথির গুরুত্ব অনেক।"

"কিন্তু এই চক্রসম্বর না কী একটা বললেন, সেটা কী বস্তু? মানে পুঁথিটায় কী লেখা আছে? গুপ্তধনের হদিশ?"

"না রে..." দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন নারানজ্যেঠু, "গুপ্তলিপি বা গুপ্তধন নয়। এখানে চক্রসম্বর নামের এক বৌদ্ধ দেবতার পুজো-ধ্যান এ-সবের পদ্ধতি লেখা আছে। এই চক্রসম্বর হলেন বৌদ্ধদের একজন অতি ভয়ঙ্কর দেবতা। এঁর মূর্তি এতই ভয়াবহ যে রাত-বিরেতে দেখলে ঘাবড়ে যাবি তোরা।"

"সে না-হয় বুঝলাম, কিন্তু পুঁথিটা এত দামি কেন? মানে এ-রকম পুঁথি-টুঁথি তো আর দুনিয়াতে কম কিছু নেই। এটা এমন কী স্পেশাল যে লোকজন এর পেছনে একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছে?"

গম্ভীরমুখে মাথা নাড়লেন নারানজ্যেঠু, "এ-রকম পুঁথি যে দুনিয়ায় কম নেই সে কথাটা সত্যি। তবে তার মধ্যেই যে বেশ কিছু পুঁথি একেবারে তোলপাড় ফেলে দেওয়ার মতো সে-ও তো তোরা জানিস। ডেড সি স্ক্রোলের নাম শুনেছিস তো? ধরে নে এটাও সে-রকমই একটা পুঁথি।"

"কেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"তার কারণ এই পুঁথিটার এমন দুটো বৈশিষ্ট্য আছে যা এই পুঁথিটাকে অমূল্য করে তুলেছে।"

"কী-রকম?" আমরা দু'জনেই বেশ ঘনিয়ে এলাম।

"প্রথম হচ্ছে এর লিপি। জানি না তোরা জানিস কি না, বৌদ্ধ দেবদেবীদের পুজো-আচ্চা করার নিয়মাবলী নিয়ে যে-সব পুঁথি আজ অবধি পাওয়া গেছে তার সবক'টাই সংস্কৃতে লেখা। কিন্তু এই পুঁথিটা লেখা একটা সম্পূর্ণ অন্য ভাষায়। কী সেই ভাষা সেটা বল দেখি?" প্রশ্ন করলেন নারানজ্যেঠু।

"চর্যাপদের বাংলা?" জিগ্যেস করল তাপস।

উত্তর শুনে তাপসের দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন দত্তসাহেব, "বাহ, তোমার ভাইপোটি তো বেশ ইনটেলিজেন্ট দেখছি নারান।"

চর্যাপদের ব্যাপারটা যে একটু আগেই জেনেছি সেটা বেমালুম চেপে গেলাম দু'জনেই।

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। চর্যাপদের পুরোটাই সহজিয়া বৌদ্ধদের গান দোঁহা এ-সব নিয়ে লেখা। এদিকে আবার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কোনও ধারণী বা সূত্র চর্যাপদের ভাষায় লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। তাই সেদিক দিয়ে তো এই পুঁথিটা অমূল্য তো বটেই। তবে দ্বিতীয় কারণটাই মোক্ষম। সেটাই এই পুঁথিটাকে অসাধারণ আর অমূল্য করে তুলেছে।"

এবার আর আমাদের কাউকে কিছু বলতে হল না। আমরা বড়-বড় চোখ করে কথাগুলো গিলছিলাম শুধু।

"সেটা বলার আগে একবার জেনে নেওয়া দরকার, বাংলা ভাষার ইতিহাসের ব্যাপারে তোমাদের কী-রকম-কী আইডিয়া?"

বলা বাহুল্য দু'জনেই জানালাম যে আমাদের এই বিষয়ে বিশেষ কেন, কোনও আইডিয়াই নেই। দত্তসাহেব বোধহয় মনে-মনে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি নারানজ্যেঠুকে বললেন, "একটা চা দিতে বলো না তোমার ওই কাজের লোকটাকে, তেনজিং না কে যেন?"

"আপনার স্মৃতিশক্তিরও বলিহারি যাই দাদা। বলি তেনজিং কয়েকদিনের জন্য দেশে যাচ্ছে শুনে এই লোবসামকে যে আপনিই জুটিয়ে দিলেন, সেটা কি একবারেই ভুলে মেরে দিয়েছেন?" উঠে যেতে-যেতে বললেন নারানজ্যেঠু, "বাংলা আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া কি আর কিছুই মনে থাকে না আপনার?"

কথাটা শুনে দত্তসাহেব যে একটু অপ্রস্তুত হলেন সে বলাই বাহুল্য। তবে সে মুহূর্তের জন্য, নারানজ্যেঠু ভেতরে চলে যেতেই চেয়ারে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে গুছিয়ে বসলেন দত্তসাহেব। বোঝা গেল যে তাঁর লুপ্ত কনফিডেন্স ফিরে এসেছে।

"চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পুঁথি সেটা তো জানোই। তা সেটা কবে লেখা হয়েছিল সেটা জানো তো?"

আমাদের মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই তিনি বুঝে নিলেন যে উত্তরটা কী হতে পারে।

"সুনীতিকুমার চাটুজ্জের মতে চর্যাপদ লেখা হয়েছিল মোটামুটি ন'শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এ-নিয়ে পণ্ডিতমহলে এখনও বিস্তর বিতর্ক আছে যদিও। তবে এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত। আমিও এ-নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছি। আমার মতে চর্যাপদের সময়কাল কিছুতেই একাদশ শতাব্দী, মানে হাজার থেকে এগারোশোর পর হতে পারে না। আমার মতে ওই একশো বছরের মধ্যেই চর্যাপদ সঙ্কলিত হয়েছিল।

'এবার বলো তো বাপু, চর্যাপদের পর নেক্সট কোন বইকে আমরা বাংলা ভাষায় লেখা দ্বিতীয় বই বলে গণ্য করি?"

বলা বাহুল্য, এ-সব আমাদের জানার কথা নয়। তাই উত্তরটাও দত্তসাহেবই দিলেন, "বইটার নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা। বেসিক্যালি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা একটি গীতিকাব্য, প্রথম আর শেষদিকের পাতাগুলো পাওয়া যায়নি। ফলে এটাও ওই চর্যাপদের মতোই কত সালে লেখা সেটা সঠিক জানা যায় না। তবে আমরা ওই মোটামুটি চতুর্দশ শতকটাকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল বলে ধরে থাকি। অর্থাৎ তেরোশো থেকে চোদ্দশো সালের মধ্যে, চৈতন্যদেব জন্মাবার আগে।"

ইতিমধ্যে নারানজ্যেঠু ফিরে এসেছিলেন। হাতে একগোছা কাগজ। আমাদের আলোচনার শেষের দিকটা যে তিনি শুনেছেন বোঝা গেল যখন তিনি যোগ করলেন যে, "চর্যাপদের পুঁথি কোথা থেকে পাওয়া যায় সে তো সকালেই শুনলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটা কোত্থেকে পাওয়া যায় জানো তো?"

আবার না-সূচক ঘাড় নাড়তে আমাদের যে বেশ লজ্জাই হচ্ছিল সে-কথা আর বলে কাজ নেই।

"উনিশশো নয় সালের ঘটনা। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামের এক বাসিন্দা, নাম বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, আশেপাশের গ্রামে প্রাচীন পুঁথির খোঁজপত্তর করছিলেন। এই করতে-করতেই উনি বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামের একজন বেশ পয়সাওয়ালা গেরস্তের বাড়ি পৌঁছোন। সেখানে মুখুজ্জেবাবুর গোয়ালঘরের মাচায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথিটা খুঁজে পান বসন্ত রঞ্জন। পরে জানা যায় যে এই দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনবিষ্ণুপুরের রাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের মেয়ের দিকের বংশধর। পুঁথিটির সঙ্গে একটা চিরকুট পাওয়া যায়। সেই থেকে জানা যায় যে আড়াইশো বছর আগে বইটা বিষ্ণুপুরের 'গাঁথাঘর' অর্থাৎ রাজ লাইব্রেরিতে ছিল।"

"কিন্তু তার সঙ্গে এই চক্র সংবর্ধনা না কী নাম, সে-পুঁথির সম্পর্ক কী?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নারানজ্যেঠু গলা পরিষ্কার করে নিলেন একবার। তারপর বললেন, "ওইদিকে চর্যাপদ আর এইদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই দুয়ের মাঝখানে আড়াইশো থেকে তিনশো বছরের লম্বা গ্যাপ। এর মধ্যে লেখা বাংলাভাষার আর কী-কী নিদর্শন পাওয়া গেছে বলো তো?"

আমরা ঠায় বসে রইলাম। মুখে কথা জোগালো না।

আস্তে-আস্তে বুড়ো আঙুল নাড়ালেন দত্তসাহেব, "একটাও না। সেই সময়ের বাংলায় লেখা একটা পুঁথিও আজ অবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ সে-সময়ে কি বাংলা ভাষায় আর কোনও কিছু লেখা হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি সে-সব পুঁথিপত্তরের একটাও যে কেন পাওয়া যায়নি, সে-ও এক রহস্য। অথচ

সেই একই সময়ে সংস্কৃতে লেখা বেশ কিছু পুঁথি কিন্তু পাওয়া গেছে, যেমন ধরো জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দ। কিন্তু বাংলা ভাষা বা লিপির কোনও চিহ্নই নেই।”

এবার দু’জনেই আমাদের দিকে ঝুঁকে এলেন, নারানজ্যেঠু ফিসফিস করে বললেন, “এখানেই এই পুঁথিটার মাহাত্ম্য। আমাদের মতে এই পুঁথি হচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের বাংলার ভাষা, হরফ আর লিপির একমাত্র নমুনা।”

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এবার বলা শুরু করলেন দত্তসাহেব, “আমরা চর্যাপদ থেকে সেই সময়কার বাংলা ভাষার একটা আন্দাজ পাই। তারপর আড়াইশো তিনশো বছর কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক! তার পরেই সোজা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন! শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলা ভাষা কোন পথে এগিয়েছে, সে-সব আমরা খুব ভালো করে জানি। শুধু জানি না বাংলা ভাষা আর লিপির ওই তিনশো বছরের ইতিহাস। কী হে ভাইপো, বুঝলে কিছু?”

তাপস একদৃষ্টিতে ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। বাঘাটে পুলিশি গলায় শেষের শব্দদুটো কানে যেতে একটু নড়ে-চড়ে বসল সে।

“এই পুঁথিটা হচ্ছে সেই মিসিং লিঙ্ক, আর সেইজন্যই এটা অমূল্য। টাকা দিয়ে এর কোনও পরিমাপ হয় না।” চাপা অথচ কনফিডেন্ট গলায় বললেন নারানজ্যেঠু।

তাপস দেখলাম ভুরু কুঁচকে কী-সব ভাবছে। কিছুক্ষণ বাদে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু পুঁথিটা যে ওই সময়কারই, সেটা কী করে বুঝলেন?”

“ভাষা দেখে, সিম্পল। চর্যাপদের ভাষা জানো তো? ‘সোনে ভরিলী করুণা নাবী/ রূপা থোই নাহিক ঠাবী।’ অর্থাৎ করুণা নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ, রূপা রাখার জায়গা নেই। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা হচ্ছে “রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী। তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিঁক মুরারী।” অর্থাৎ রাজা কংসের কাছে আমি কাতর প্রার্থনা করব যাতে কংস তোমাকে হত্যা করেন। এই পুঁথিটার ভাষা ঠিক এই দুইয়ের মাঝামাঝি। যেমন ধরো, উমমম, এ-রকম হতে পারে-” বলে আবৃত্তি করলেন দত্তসাহেব,

“দেও চক্কসম্বরঅ দেঁয় কালযানঅ
দশবোধিঁউ মুকে করিঅ দানঅ
সত্তসঙ্গ করি বিচরণ মুঞি
বুঝিঁউ দেওকিপা লুটলুঁ উঁঞি।”

“আমি বাক্যগঠন, ব্যাকরণ ইত্যাদি দিয়েও বুঝিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এই ভাষার প্রকারভেদটাই হচ্ছে বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায়।” বলে নারানজ্যেঠুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “আজ কিছু পাব নাকি?”

নারানজ্যেঠু হাতে ধরা কাগজের গোছাটা এগিয়ে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, “বাইশ থেকে আঠাশ নাম্বার পাতা অবধি কপি করেছি। সঙ্গে টীকাও করেছি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মতো। আশা করি গতবারের মতো এবারেও আপনি বেশ কিছু ভুল খুঁজে পাবেন এর মধ্যে।”

ব্যাপারটা আমার বেশ আশ্চর্য লাগল। পুঁথিটা দত্তসাহেব নিশ্চয়ই পড়েছেন। তিনি তো তাহলে নিজেই কপি করে নিতে পারেন। তাঁকে কপি করে দিতে হচ্ছে কেন?

দত্তসাহেব বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। কাগজের গোছাটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে তেরচা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমার জ্যেঠাটিকে যতটা সহজ ভাবো ততটা সহজ উনি নন ভায়া। যদি ভাবো তুমি বললেই উনি ঝপাস করে পুঁথিখানা এনে তোমার কোলে ফেলে দেবেন, তবে সে-

গুড়ে শুধু বালি নয়, সেই চন্দননগর। আজ অবধি পুঁথিখানা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য এই শর্মারও হয়নি। এই যে এতক্ষণ ধরে তোমাদের জ্ঞানবিতরণ করলুম, সে-ও এই তোমাদের জ্যেঠার করে দেওয়া কপি-র দৌলতে। উনি খুব সম্ভবত ভাবছেন যে পুঁথিটা একবার দেখলেও রাস্তা থেকে লোকজন এসে আমাকে ছুরি মেরে যাবে। হুঁহ্‌, যত্তসব।”

জ্যেঠু বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না। হাসিমুখে বললেন, “আপনাকে তো আগেই বলেছি দাদা, ও-জিনিসের ওপর সাঙ্ঘাতিক কিছু লোকের নজর আছে। আপনি তাদের চেনেন না, কিন্তু আমি বোধহয় চিনি। আমি কিছুতেই আপনাকে এর মধ্যে টেনে আনতে পারি না।”

দত্তসাহেব গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে গেলেন। জ্যেঠু খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, “চল রে তপু, লোবসামকে গাড়িটা বের করতে বলি। সুবোধ তো বোধহয় প্রথমবারের জন্য দার্জিলিং এল। ওকে দার্জিলিংটা ভালো করে দেখাব না, সে কি হয়? আজ ম্যালটা ঘুরে নে তোরা। কাল ভোরে টাইগার হিল থেকে শুরু করে আশেপাশের কিছু ট্যুরিস্ট স্পটে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। তারপর দুপুর-দুপুর বেরোলে রাত আটটার মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে যাবি। একবার দুগ্গা-দুগ্গা করে কলকাতা পৌঁছো তারপর কোথায় পুঁথিটা পৌঁছে দিতে হবে সেটা আমি পরে ফোন করে বলে দেব।”

“ইয়ে, কিন্তু পুঁথিটা হাতে পাব কখন?” ইতস্তত করে প্রশ্ন করলাম আমি, “মানে আপনাকে ব্যাঙ্কে যেতে হবে না? কাল তো সারাদিনই শুনলাম ঘোরাঘুরি আছে।”

নারানজ্যেঠু কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে হো-হো হাসিতে ফেটে পড়লেন, “তোমার কী ধারণা সুবোধ, ওটা আমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছি?”

“রাখেননি?” এবার আমার অবাক হওয়ার পালা, “তাহলে ইয়ে, মানে কোথায় রেখেছেন? আর আমরাই বা কখন আর কী-ভাবে হাতে পাব ওটা?”

ধীর স্বরে বললেন নারানজ্যেঠু, “ধীরে বৎস, ধীরে। যখন সময় হবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। কখন কী-ভাবে ওটা তোমাদের ট্রেনের কামরায় পৌঁছে দেওয়া হবে সে-দায়িত্ব আমার।”

এর ওপরে আর কথা হয় না। উঠতে-উঠতে তাপস শুধু একটাই প্রশ্ন করল, “আপনার এই কাজের ছেলেটি, মানে লোবসামের বাড়ি কোথায়?”

নারানজ্যেঠু বললেন, “ওই যে হরসিং হাট্টা বলে গ্রামটা দেখালাম না? ওখানে।”

“একে আপনি পেলেন কোথা থেকে?”

“ওর কাকার নাম বীরেন্দ্র থাপা, সে এই দত্তদা-র বাড়িতে কাজ করে। কাজ বলতে গাড়ি চালানো, বাজার করা, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা, এই আর কি। ছোকরার বাপ-মা নেই, ছোটবেলা থেকে কাকার কাছেই মানুষ। পড়াশোনাও বেশিদূর করেনি। তেনজিং ছিল আমার ডানহাত, ম্যান ফ্রাইডে বললেই চলে। এই মাস-দুয়েক আগে এক সকালে দেখি সে হাপিস, কাউকে না বলে একেবারে উধাও। বাড়ি থেকে কিছু চুরিটুরি যায়নি বলে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। আমি লোক খুঁজছি শুনে ওর কাকাই একদিন দত্তদাকে বলে-কয়ে আমার বাড়িতে এই লোবসামকে কাজে ঢুকিয়ে দেন। কেন বল তো?”

“না কিছু না। এমনি।” বলে উঠে পড়ে তাপস।

*

দার্জিলিং আমি কমপক্ষে বার-তিরিশেক গেছি আজ অবধি, পরেও যাব। কিন্তু সেই ছিল আমার প্রথম দার্জিলিং দেখা। আর সে-দেখাও এমন একটা কাহিনির মধ্যে দিয়ে যে এখনও আমার মনে একটা স্থায়ী ছাপ

রেখে গেছে। তবে এ-কথাটা মানতেই হবে যে গুচ্ছের ট্যুরিস্ট গিয়ে-গিয়ে জায়গাটা এখন বিস্তর ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে গেছে। তখন পাহাড়ের রানি অনেক বেশি সুন্দর ছিল।

লেবং থেকে দার্জিলিং ম্যাল-এ যাওয়ার রাস্তাটা ভুটিয়া বস্তির মধ্যে দিয়ে। নারানজ্যেঠুর গাড়ি করে যেতে-যেতে দু'পাশের সৌন্দর্য দেখে তো আমি মোহিত। উঁচু-উঁচু পাইন আর ফার গাছের জঙ্গল, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে রাস্তার ওপর, আর চারিদিকে নাম-না-জানা পাখির ডাক। পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে, খাদের গা বেয়ে-বেয়ে রাস্তা। একটা হেয়ার পিন ব্যান্ড ঘুরেই দেখি কতগুলো ভুটিয়া মেয়ে কাঁধে বিশাল বড় বেতের ঝুড়ি নিয়ে দল বেঁধে হাঁটছে। নারানজ্যেঠু বললেন ওরা যাচ্ছে কাছেরই একটা টি-এস্টেটে চা-পাতা তুলতে। "এদের মতো কষ্টসহিষ্ণু জাত কমই আছে হে। এই দেখছ এরা ডিউটিতে যাচ্ছে, এখন সারাদিন ধরে চা-পাতা তুলবে বাগান থেকে। তারপর বাড়ি গিয়ে ঘর সংসার সামলানো, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবা করা, এ-সব তো আছেই। তবুও দেখো, মুখের হাসিটি কিন্তু অমলিন।"

দার্জিলিং ম্যালে পৌঁছোতে সময় লাগল আধ-ঘণ্টাটাক। গিয়েই বুঝলাম অমন রংবাহারি জব্বর জায়গা আজ অবধি কমই দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও একই জায়গায় নানা জাতের নানা ভাষার আর নানা সাইজের অত ট্যুরিস্ট দেখা অসম্ভব। দিশিদের মধ্যে অবশ্য বাঙালিরাই বেশি। তাদের চেনার উপায়ও খুব সহজ, সোয়েটারচাপা ভুঁড়ি আর বোকা-সোকা মাঙ্কি ক্যাপ। ম্যালের মাঝমাঝি বেশ কয়েকটা রুগ্ন ঘোড়ার ওপরে চেপে হর্স রাইডিং করছে পুরুষ্টু বাচ্চারা, দেখে আমার ঘোড়াগুলোর জন্য বেশ কষ্টই হল। ম্যালের একদিকের একটা খাদের ধার ঘেঁষে বেঞ্চি বসানো, সেখানে লোকজন বসে রোদ পুইছে। বাকি ম্যাল জুড়ে বাচ্চাকাচ্চাদের ক্যালরব্যালরে, বড়দের হাঁকারে, টাট্টুঘোড়ার টগবগানিতে সে একেবারে জমজমাট ব্যাপার।

নারানজ্যেঠু এসেই একটা বেঞ্চির কোনা দখল করে বসেছিলেন। তিনি পাইপ ধরানোর চেষ্টা করছেন দেখে আমি আর তাপস অন্যদিকে হাঁটা দিলাম। তাপস অবশ্য একটু পরেই অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারি লেখা মস্ত বড় একটা বইয়ের দোকান দেখে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আমি আবার বইয়ের ভক্ত নই। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি পাশেই একটা টিবেটান কিউরিও শপ। তার ভেতরে ঢুকে সিল্কের কাপড়ের ওপর আঁকা একটা অদ্ভুত দেখতে দেবতার ছবি দেখছি, এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ওটাকে বলে থাংকা। টিবেটান আর্ট। আর যে-দেবতার ছবিটা অত মন দিয়ে দেখছ, ওনার নাম বজ্রভৈরব। ভারি ভয়ংকর দেবতা।"

ঘুরে দেখি আর কেউ নয়, আমাদের পথের আলাপী দেবাশিস বণিক।

দেবাশিসদা আমার দিকে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "কেমন ভায়া, বলেছিলাম না দেখা হয়ে যাবেই। তা হাতে যেটা নিয়েছ সেটা কিন্তু খুবই উমদা চিজ। ভালো দাঁও পেলে ছেড়ো না হে, ওয়াল হ্যাঙ্গিং হিসেবে দারুণ।"

মনে পড়ে গেল যে ভদ্রলোক বলেছিলেন উনি একটা কিউরিও শপ চালান কলকাতায়। ফলে এ-সব নিয়ে যে ওঁর একটা থরো নলেজ থাকবেই সে আর আশ্চর্য কী?

হাতের থাঙ্কাটা রেখে দিয়ে দু'জনে বাইরে এলাম। দেবাশিসদা বললেন, "দোকানের জন্য কেনাকাটি করতে প্রায়ই দার্জিলিংয়ে আসতে হয় আমাকে। আর শুধু দার্জিলিং কেন, নেপাল, ভুটান এ-সব জায়গাতেও যাই বছরে দু-একবার। গেল বছর তো একটা বারোশো বছরের পুরোনো তিব্বতি ধনুকের খোঁজে লাসা-তেও গেসলুম, যেটা দিয়ে নাকি লামা পালগি দোরজে অত্যাচারী রাজা লাংদারমাকে বধ করেছিলেন। গিয়ে দেখি পুরো জালি কেস, বুঝলে। মাঝখান থেকে যাওয়া-আসার খরচাটাই জলে।"

"কী করে বুঝলেন জালি কেস?" আমার বেশ কৌতূহল হল। যদিও এই পালগি দোরজে বা লাংদারমা এরা কে বা কারা সে-নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও আইডিয়া নেই।

“ওই সময়ের টিবেটান ধনুক বিশেষ ধরনের হত বুঝলে, চিনের তাং পিরিয়ডের লং-বো যেমন হত, সেই টাইপের। কিন্তু যে ধনুকটা দেখানো হল, সেটা দেখেই বুঝলাম যে ওটা চিনের মিং রাজত্বের সময়কার রিফ্লেক্স বো ছাড়া আর কিছু নয়। মিং রাজত্ব শুরুই হয় লাংদারমাকে হত্যা করার দুশো বছর পর। ফলে ওটা জালি কেস নয় তো কী?”

বলা বাহুল্য, আমি এ-সবের কিছুই বুঝলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম যে এ-সব ঐতিহাসিক জিনিসপাতি নিয়ে ভদ্রলোকের অসীম জ্ঞান।

ততক্ষণে বইয়ের দোকান থেকে তাপসও বেরিয়ে এসেছে। আমাদের দেখেই এগিয়ে এল সে, ঠোঁটের কোনায় একটা চাপা হাসি, যার মানেটা আমি বিলক্ষণ চিনি।

“এসো ভায়া।” সোল্লাসে বললেন দেবাশিসদা, “এই এতক্ষণ তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। দার্জিলিং ঘুরছ কেমন?”

আমরা দু’জনেই যে ভালো ঘুরছি সে-কথাটা ভদ্রলোককে জানানো হল। উনি পরের প্রশ্নটা ফের তাপসকেই করলেন, “হাতে ওটা কী? বই কিনলে নাকি?”

আমিও আগে খেয়াল করিনি। ঘুরে দেখি তাপসের হাতে একটা বই, বুদ্ধিজম ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল, লেখক জেমস হুইটলার। দেবাশিসদা চোখ গোলগোল করে বললেন, “আরিব্বাস। দুর্দান্ত বই পেয়েছ ভায়া। এ-জিনিস তো বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট ছিল। পেলে কী করে? তা তোমারও কি আমার মতো এই লাইনে ইন্টারেস্ট আছে নাকি?”

তাপস ওর ওই চাপা হাসিটা ঠোঁটের এককোণে চালান করে বলল, “ওই আর কি। তা আপনি আপনার দোকানের জন্য ভালো মেটেরিয়াল পেলেন কিছু?”

দেবাশিসদা হাত উলটে বললেন, “কই আর পেলাম। কয়েকটা মূর্তি, দুটো ঘণ্টা আর একটা প্রদীপ। তা-ও কোনওটাই একশো বছরের পুরোনো নয়। প্রদীপটাই যা একটু পদের, দলাই লামার প্যালেসে জ্বালানো হত বলছে। দেখি কী দর ওঠে। তা এখানেই কথাবার্তা বলবে নাকি নাথমলের চায়ের দোকানে দার্জিলিং-এর অথেনটিক চা খেতে-খেতে আড্ডাটা দেবে?”

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম তাপস তাকিয়ে আছে ম্যালের ঠিক উল্টোদিকে। এখন একটু দুপুর-দুপুর, ট্যুরিস্টরা যে যার হোটেলে ফিরে গেছে লাঞ্চ করবে বলে। ম্যালে লোক একটু কম, ওদিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনজনেই দেখলাম যে ওদিকে তখন নারানজ্যেঠুর পাশে একটা লোক বসে আছে। লোকটাকে দেখতে কেন জানি না একটু অদ্ভুত লাগল আমার। কেন লাগল সেটা তখন বুঝিনি, বুঝেছিলাম পরে। শুধু এইটা নজরে পড়ল যে নারানজ্যেঠু সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলছেন, আর বলছেন চাপা, কিন্তু খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে।

দেবাশিসদার দিকে তাকালাম। মনে হলো লোকটা যেন দু’চোখ দিয়ে দৃশ্যটা গিলছিল। তাপসও বোধহয় সেটা আঁচ করে স্বাভাবিক ভাবেই বলল, “চলুন দেবাশিসদা, কোথায় দার্জিলিংয়ের অথেন্টিক চা খাওয়াবেন বলছিলেন না?”

দেবাশিসদাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদিক থেকে এদিকে মাথাটা ঘোরাতে বাধ্য হলেন। তারপর অমায়িক হেসে বললেন, “আচ্ছা চলো। মকাইবাড়ির ফার্স্ট ফ্লাশের চা খাওয়াব তোমাদের। অটাম ফ্লাশের মতো অত চমৎকার গন্ধ পাবে না হয়তো, তবে লিকারটি কিন্তু একেবারে মারহাব্বা দুর্দান্ত।”

সেদিনের আড্ডাটা তেমন আর জমেনি ভালো। তবে ভদ্রলোকের দৌলতে চায়ের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানলাম। মোটমাট বোঝা গেল ভদ্রলোকের বেশ কিছু বিষয়ে ভালো জ্ঞান আছে। আর কথা বলতেও পারেন বেশ গুছিয়ে। এ-গুণটা বোধহয় কিউরিও শপ চালিয়ে আয়ত্ত্ব করেছেন। আমার কেন যেন একবার মনে হল

কোনও হাইস্কুলের ইতিহাস টিচার হিসেবে ভদ্রলোককে মানাতো বেশ। আর হ্যাঁ, সেদিন যে চা খেয়েছিলাম, মিথ্যে বলব না, সে-স্বাদ আজও মনে আছে।

নাথমলের দোকান থেকে বেরিয়ে নীচের দিককার রাস্তাটা ধরলেন দেবাশিসদা, বললেন মহাকালের মন্দিরটা একবার ঘুরে যাবেন, "আকাশ ক্লিয়ার থাকলে ওখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা দুর্দান্ত ভালো ভিউ পাওয়া যায়। দেখি একবার ট্রাই নিয়ে।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল তাপস। আমি একবার ঠেলা দিয়ে বললাম, "কী রে, কী দেখছিস?"

তাপসের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসিটা ফিরে এল, তারপর বলল, "ভদ্রলোক ধুরন্ধর বটে, তবে মিথ্যে কথা বলার আর্টটা এখনও ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারেননি। ইনি অটাম ফ্লাশ আর ফার্স্ট ফ্লাশের তফাত বোঝেন না, মিং আর তাং ডাইন্যাস্টির টাইম পিরিয়ড গুলিয়ে ফেলেন... কিন্তু নিজেকে কিউরিও শপের মালিক বলে পরিচয় দেওয়ার এত আগ্রহ কেন কে জানে!"

আমি কিছু বলার আগেই নারানজ্যেঠু কাছে এসে দাঁড়ালেন। বোঝাই যাচ্ছিল যে জ্যেঠু একটু উত্তেজিত হয়ে আছেন। আমাদের বললেন, "চল, বাড়ি যাই। লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে না হয় আবার আসা যাবে, কেমন?"

তখন যদি জানতাম, বিকেলের দিকে এদিকেই আসতে হবে বটে, তবে ঘুরতে নয়, অন্য কাজে!

*

সেদিন দুপুরের খাওয়াটা জব্বর হয়েছিল। লোবসাম পাকা রাঁধুনে, রাই শাক আর মাটন দিয়ে কী একটা নেপালি ডিশ বানিয়েছিল। আমি তো চেয়ে-চেয়ে দু'বার খেলাম। তাপসেরও দেখলাম চিকেনের ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে চোখ দুটো বুজে এসেছে। মেন কোর্সে অবশ্য একটা দিশি মুর্গির ঝোল ছিল। তেল-মশলাহীন, কিন্তু অতীব সুস্বাদু।

খেয়ে-টেয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে দিবানিদ্রার উদ্যোগ নিচ্ছি, এমন সময় ঘন-ঘন কলিং বেলের আওয়াজ। আমি একেবারে অবটিউস অ্যাঙ্গেলে চিত হয়ে শুয়েছিলাম, নড়াচড়ার কোনও উপায়ই ছিল না। অগত্যা তাপসই দেখতে গেল কেসটা কী।

তাপস ফিরে এল ঠিক দু'মিনিটের মাথায়। ঝড়ের বেগে একটা জিন্স শর্টসের ওপরেই গলিয়ে নিতে-নিতে বলল, "ঝটপট তৈরি হয়ে নে। ম্যাল রোডের পাশের একটা লজে একজন খুন হয়েছে। ইনস্পেক্টর গুরুং এসেছে জ্যেঠুকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বডি শনাক্ত করতে হবে।"

আমার মাথাটা পুরো ঘেঁটে গেল। কে খুন হয়েছে, কেনই বা খুন হয়েছে, আর তার বডি শনাক্ত করার জন্যে নারানজ্যেঠুকেই বা যেতে হবে কেন সেটা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরছিল না। তবে তাপসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরি হয়ে নিতে আমার সময় লাগল ঠিক দু'মিনিট।

আমরা যখন পুলিশের জিপে করে যাচ্ছি, তখন বিকেল শুরু হয়েছে। রাস্তাটাও পুলিশের জিপের বাকি সব্বার মতো খুব গম্ভীর। ড্রাইভার সাহেব দেখলাম এই কমে আসা আলোতেও কালো গগল্স্ পরে গাড়ি চালাচ্ছেন। পাকা হাত, গাড়ি তো চলছে না, মনে হচ্ছে যেন মসৃণ ভাবে উড়ে যাচ্ছে। পাশে বসে আছে গুরুং, সে-ও উৎকট রকমের গম্ভীর মুখে চুপ করে আছে। পেছনে আমি, তাপস, নারানজ্যেঠু আর দু'জন কনস্টেবল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমি যে-আঁধারে ছিলাম, সেই আঁধারেই।

লজটায় পৌঁছতে লাগল ঠিক পঁচিশ মিনিট। ম্যালের যে-রাস্তাটা গ্লেনারিজের দিকে গেছে, সেটা দিয়ে একটু নীচে নেমে ডানদিকে একটা হেয়ার-পিন বেন্ড আছে। ঠিক তার মুখেই লজটা, নাম ড্যাফোডিল। খুনটা যে

ওখানেই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে লজের সামনে জমে ওঠা উত্তেজিত ভিড়টা দেখে। আমাদের জিপ দরজার সামনে এসে থামতেই ভিড়টা সরে গিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল।

লজটা দেখেই বোঝা যায় যে সস্তার জায়গা। বিবর্ণ হলদেটে রঙ, এদিক-ওদিক শ্যাওলা ধরে আছে। ঢোকার দরজাটাও বোধহয় ব্রিটিশ আমলের বানানো, নেহাত দামি সেগুন কাঠ বলে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, নইলে কবেই খসে পড়ে যেত। রিসেপশনে দাঁড়িয়ে ছোট-খাটো চেহারার অল্পবয়সী রিসেপশনিস্ট কাম ম্যানেজারটি বলির পাঁঠার মতো কাঁপছিলেন। গুরুংকে দেখেই অবোধ্য বাংলা মেশানো হিন্দিতে হাউমাউ করে কী-সব বকে যেতে থাকলেন। বক্তব্যটা বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁর কথায় ড্যাফোডিলের প্রায় আশি বছরের ইতিহাসে এরকম দুর্ঘটনা কখনও ঘটেনি। এতে তিনি বা তাঁর কর্মচারীদের কেউ জড়িত থাকার কথা ভাবাই যায় না। তিনি থাকতে লজের এমন বদনাম হল ভেবে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে। পুলিশ সাহেব যেন ডেডবডিটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই নোংরা ব্যাপারটার একটা দ্রুত সুরাহা করেন।

গুরুং যে-চাউনিটা দিল, দেখে আমারই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল, ম্যানেজারটির তো কথাই নেই। কাটাকাটা স্বরে গুরুং জিজ্ঞেস করল, “আপনার বয়েস কত?”

ম্রিয়মাণ স্বরে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, “আটত্রিশ।”

“এই চাকরিতে আপনার ক’দিন হল?”

“আজ্ঞে ছ’মাস।”

“ছ’মাসেই আপনি লজের আশি বছরের ইতিহাস জেনে গেলেন?”

স্পষ্ট দেখলাম ভদ্রলোক বার-দুয়েক খাবি খাওয়ার মতো মুখ করে ঢোঁক গিললেন। গুরুং সেদিকে তাকিয়ে পরের প্রশ্ন ছুড়ে দিল, “লজের মালিক তো আপনি নন। নাম কী মালিকের? আর তিনি আছেন কোথায় এখন?”

জানা গেল যে লজের মালিক কুচবিহারের এক বাঙালি ভদ্রলোক, উত্তরাধিকার সূত্রে এই লজের মালিকানা পেয়েছেন। মালিকের আসল ব্যবসা জড়িবুটির, বহুদিন ধরে কলকাতা আর দিল্লির বিভিন্ন ফার্মে আয়ুর্বেদিক ইনগ্রেডিয়েন্ট সাপ্লাই করে থাকেন। ড্যাফোডিল লজটা ওঁর সাইড ব্যবসা, ওটা ম্যানেজারের ওপরেই ছেড়ে রাখেন। আপাতত তিনি অকুস্থলে নেই, ফুন্টশোলিং গেছেন ভুটান থেকে আসা কিছু শেকড়বাকড়ের খোঁজে। তবে খবর পাওয়ামাত্র শিলিগুড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন, রাতের মধ্যেই এসে পড়বেন আশা করা যায়।

“হুম।” বলে মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা ভাবল গুরুং, তারপর বললো, “বডিটা কোথায়?”

ম্যানেজারবাবুটি শশব্যস্ত হয়ে বললেন, “ওঁর ঘরেই স্যার, রুম নাম্বার তিনশো দুই।”

“প্রথম খবরটা কে দেয়?”

“ওয়েটার রামবিলাস স্যার। গেস্ট লাঞ্চের সময় বাইরে গেছিলেন। ফিরে আসেন বেলা দেড়টা নাগাদ। তারপর একজন আসেন গেস্টের সঙ্গে দেখা করতে।”

“আপনারা বাইরের লোককে গেস্টদের রুমে ঢুকতে অ্যালাউ করেন?”

“করি স্যার, তবে গেস্টকে জিজ্ঞেস করেই। এক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিলো। গেস্ট অনুমতি দেওয়ার পরেই আমরা ভিজিটরদের গেস্টদের রুমে যেতে অ্যালাউ করি।”

“তারপর?”

“ভিজিটর বোধহয় গেস্টের রুমে আধ-ঘণ্টাটাক ছিলেন। তারপর চলে যান। তারও আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর পাশের ঘরে যিনি ছিলেন -মিস্টার গাঙ্গুলি, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বাইরে যাবেন বলে। তিনিই তিনশো দুইয়ের দরজার নীচ থেকে রক্ত চুঁইয়ে আসছে দেখে আমাদের খবর দেন।”

“হুম। তা আপনার এই মিস্টার গাঙ্গুলি আছেন কোথায় এখন? নিজের রুমেই?”

“আর বলবেন না স্যার। ওনার নাকি রক্ত দেখলে মাথা ঘোরে। তাই চটপট ওনাকে কাছেই রিপোজ নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়েছি। কী হ্যাপা বলুন তো? এদিকে এই খুন, ওদিকে অসুস্থ রুগি...” কাঁদো-কাঁদো গলায় নিজের করুণ অবস্থাটা দাখিল করলেন ম্যানেজার সাহেব।

“তা সেই রহস্যময় ভিজিটরকে দেখতে কেমন?”

“বয়েস ধরুন মাঝবয়েসী। হাইটও অল্পও না বেশিও না। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা, কথা শুনে বাঙালি বলেই মনে হয়, তবে কথার মধ্যে হিন্দি বা উর্দু শব্দ একটু বেশি ব্যবহার করেন।”

“চশমা পরা, খুঁড়িয়ে হাঁটা, কথা বলতে গিয়ে তোতলানো, এমন কিছু নজরে পড়েছে আপনার?”

“না স্যার। মানে অত খেয়াল করে দেখিনি। আসলে জানতাম না তো যে উনি খুন করবেন। জানলে হয়তো...”

“হুম, বুঝেছি। চলুন, এবার বডিটা দেখান।”

তিনতলা লজ, প্রতিটি তলায় আটটা করে ঘর, একতলাটা ছাড়া। ওখানে অফিস, রিসেপশন, গুদোমঘর, ডাইনিং হল বাদে দুটো মাত্র ঘর। সেই দুটো আর দোতলা তিনতলা মিলিয়ে মোটামুটি আঠেরোটা ঘর বোর্ডার বা গেস্টদের। লিফট নেই, তাই পায়ে হেঁটেই উঠতে হল। তিনতলায় উঠে দেখলাম সিঁড়ি শেষ হয়ে ডানদিকে টানা লম্বা বারান্দা। বারান্দার একদম শেষে তিনশো এক নম্বর রুম। ম্যানেজারবাবু বললেন যে এখানেই নাকি সেই গাঙ্গুলিবাবু ছিলেন। আপাতত রুমটা বন্ধই আছে। গাঙ্গুলিবাবু ফিরলে তাঁর জিনিসপত্র তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

অভিশপ্ত তিনশো দুই নম্বর রুমের দরজাটা খোলাই ছিল। সেটা কেউ বন্ধও করেনি, বোধহয় পুলিশের হ্যাঙ্গামের কথা ভেবে। আমি আর তাপস উঁকি দিয়ে যে বীভৎস দৃশ্যটা দেখলাম তার কথা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে।

দেখলাম, ঘরের বিছানা থেকে দরজার মাঝের যে অংশটা, সেখানে লম্বালম্বি পড়ে আছে একটা লোক। সরি, লোক নয়, একটা দেহ। লোকটাকে চিনতে কোনই অসুবিধা হল না। আজ দুপুরেই একে ম্যালে দেখেছি আমরা, নারানজ্যেঠুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে। এখনও লোকটার গায়ে সেই একই পোশাক পরা। তফাতের মধ্যে এই যে বুকে একটা নেপালি কুকরি আমূল গেঁথে আছে, আর সারা মেঝেটা রক্তে থৈ-থৈ। যদিও সেই রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে অনেকটা। আমি তার আগে কোনওদিন খুন হওয়া মৃতদেহ দেখিনি, ভয়ে আর ঘেন্নায় আমার প্রায় বমি পাচ্ছিল। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে বমি আটকাবার চেষ্টা করছি এমন সময় দুটো জিনিস আমার নজরে পড়ল। এক, লোকটার মুখের ভাব। তাতে আতঙ্কের থেকে অবাক হওয়াটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। আর দুই, যেখানে লোকটার দেহ শুয়ে আছে, তার পাশে মেঝেতে একটা অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা। ওই রক্ত দিয়েই। চিহ্নটা ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মতো, শুধু মাথার দিকের আঁকড়িদুটোর মধ্যিখানে একটা স্টার সাইন আঁকা আছে।

চিহ্নটা আমরা সবাই দেখেছিলাম। শুধু আশ্চর্য লাগল জ্যেঠুকে দেখে। ভয়ে আর আতঙ্কে মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে জ্যেঠুর। হাতের দিকে নজর যেতে দেখলাম সামান্য কাঁপছে জ্যেঠুর হাত।

“মাস্টার সা’ব, আমাদের ইনফর্মেশন মোতাবেক আজ দুপুরে এই লোকটার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ম্যালে। ঠিক কি না? চিনতে পারছেন?” প্রশ্ন করল গুরুং।

অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিলেন নারানজ্যেঠু। নিস্পৃহস্বরে বললেন, “হ্যাঁ, না চেনার কী আছে। এই তো সকালে ম্যালে ঘুরতে এসেছিলাম, তখন পাশে বসেছিল খানিকক্ষণ। আমি পাইপ খাচ্ছি দেখে আমার কাছে তামাক চাইছিল। দিইনি বলে সামান্য তর্কাতর্কিও হল লোকটার সঙ্গে। ব্যাস এইটুকুই, তারপর

ওরাও চলে এল, আমিও ওদের নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। এখন নীচে চলো বাপু, এ-রকম রক্তারক্তির দৃশ্য আমার একদম পোষায় না।”

কথাটা যে ডাহা মিথ্যে সে না বললেও চলত। লোকে রাস্তাঘাটে পাশে বসে খইনি চায় দেখেছি। কিন্তু কেউ অচেনা অজানা লোকের কাছে পাইপ খাওয়ার তামাক চায় এই প্রথম শুনলাম। গুরুং কথাটা একবর্ণও বিশ্বাস করেনি, সে ওর মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তবে মাস্টারসা'বের প্রতি শ্রদ্ধা বা অন্য কোনও কারণে হোক, দেখলাম যে এ-নিয়ে সে আর কোনও উচ্চবাচ্য করল না। তবে তার কপাল জুড়ে থাকা গভীর ভ্রূকুটিতে বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাপারটা অত সহজে মিটে যাওয়ার নয়।

ততক্ষণে পুলিশের ফটোগ্রাফার এসে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে মৃতদেহের ছবি নিতে শুরু করেছে। গুরুং সঙ্গের দু'জন কনস্টেবলকে ওখানে দাঁড়াতে বলে নারানজ্যেঠুকে নিয়ে নীচে নেমে গেছে। ঘরের সামনে শুধু আমি, তাপস, সেই অতি নির্লিপ্ত দু'জন কনস্টেবল আর ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক। ঘরের ভেতরের দিকে তাকালেই আমার বেজায় বমি পাচ্ছিল, তাই আমি বারান্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। সেখান থেকেই একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম যে লজের সামনে কৌতূহলী জনতার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে, আর আমি ভাবছি এদের এড়িয়ে নামব কী করে। এমন সময় তাপস আমার কাঁধে হাত রেখে স্বাভাবিক স্বরে বলল, “চিন্তা করিস না, বিল্ডিং-এর পেছনে একটা সিঁড়ি আছে ওখান দিয়েই কেটে পড়ব। বাড়ি চল। কেস খুবই জটিল হয়ে উঠেছে, জ্যেঠুর সঙ্গে অনেক কথা আছে।”

*

সন্ধে সাতটা। নারানজ্যেঠুর বাংলো থেকে তাকালে পাহাড় আর উপত্যকার বুক জুড়ে নেমে আসা ঘন অন্ধকার দেখা যায়। আর দেখা যায় অন্ধকারের বুকে জেগে থাকা পাহাড়ের গায়ে বসানো বস্তির আলোর বিন্দু। সেই হিম-হিম উপত্যকার বুক থেকে পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে আসছিল আশ্বিনের রাতের কুয়াশা। আমরা চারজন তার মধ্যে জবুথবু হয়ে বসে ছিলাম।

শীতটা অবশ্য আমার আর তাপসেরই বেশি লাগছিল। বাকি দু'জন, অর্থাৎ নারানজ্যেঠু আর গুরুংয়ের অতটা ঠান্ডা লাগছিল না। হাজার হোক, ওরা এখানকারই লোক।

কথাটা শুরু করল গুরুংই, “এইবার বলুন তো মাস্টারসা'ব, আমাকে মিথ্যে কথাটা বলার দরকার কী ছিল?”

নারানজ্যেঠু বিস্ময়ের ভান করলেন, “কোথায় মিথ্যে কথা বললাম?”

অন্ধকারের মধ্যেও গুরুংয়ের বাঁকা হাসিটা নজর এড়াল না আমাদের। একটু ঝুঁকে পড়ে ও বললো, “মাস্টারসা'ব, আমি পুলিশ, আপনি টিচার। আমি ব বলতে বন্দুক বুঝি, আপনি বোঝেন বই। আমাকে এ-সব মিথ্যে কথা বলে লাভ আছে?”

আমরা টান-টান হয়ে বসলাম। মনে হচ্ছে একটা শো ডাউন হতে চলেছে। নারানজ্যেঠু দেখলাম মাথা নিচু করে বসে আছেন।

কিন্তু কোথায় কী? আমাদের সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে গুরুং খুব নরম স্বরে, আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, “লোকটা কে মাস্টারসা'ব? আমাকে সব কিছু খুলে বলবেন প্লিজ?”

অন্ধকারের মধ্যেও জ্যেঠুর ইতস্ততভাবটা আমার নজর এড়াল না। মনে হল যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন তিনি। তারপর ধীর স্বরে বললেন, “দোরজে, ওর নাম তাশি দোরজে। ও একজন অষ্টমহাসিদ্ধ।”

*

নারানজ্যেঠু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আকাশ থেকে তখন ঠান্ডা নীল আলোর স্রোত নেমে আসছিল রহস্যময় কুয়াশার মতো। তারই মধ্যে হরসিং হাট্টার বস্তি থেকে অতি ক্ষীণভাবে ভেসে আসছিল উচ্চকিত স্বরে গাওয়া নেপালি গান 'ওয়রি যমুনা পারি যমুনা, যমুনাকো ফেডেইমা মনোকামনা'। এই গানটা আজ সকালেই আমরা অন্তত বার দশেক শুনেছি, নারানজ্যেঠুর গাড়িতে যেতে-যেতে, টেপ রেকর্ডারে।

"আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভ্যাগাবন্ডের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এ-কাহিনি বোধহয় তোমরা সবাই জানো।" মৃদুস্বরে বলতে শুরু করলেন নারানজ্যেঠু। আমরা তিনজনেই আরও ঘনিয়ে এলাম গল্পটা শুনব বলে।

"তখন আমার মা মারা গেছেন। তার পরেই আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই। বাপ-দাদারা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছিলেন, তাই টাকার অভাব আমার কোনওদিনই ছিল না। যেটার অভাব ছিল, সেটা হচ্ছে সাহচর্যের। মা মারা যেতে আমি প্রায় পাগল হয়ে গেছিলাম। আমার শুধু মনে হত যে আমার মা নেই, এই দুনিয়ায় আমার দেখভাল করার মতো কেউ নেই। আমি একা, আমি অনাথ।

'জানি কথাগুলো শুনে তোমরা হয়তো আমাকে পাগল ভাবছ। কিন্তু তপুর বাবা মানে, অসীম অন্তত বলতে পারবে আমার জীবন কতটা একলা কেটেছে, আর কেন আমি মা মারা যাওয়ার পর এমন দিশাহারা হয়ে গেছিলাম।

'ছাত্রাবস্থায় আমি ঘোরতর ঈশ্বর অবিশ্বাসী ছিলাম, গোঁড়া নাস্তিক বললেই চলে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর আমার সেই বিশ্বাস টলে গেল। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়? এই যে আমার মা মারা গেছেন, তিনি মরে যাওয়ার পর কোথায় গেছেন? তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে তাঁকে হারিয়ে আমি কত কষ্টে আছি?

'এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে-করতেই পরলোকতত্ব বা প্রেততত্বের প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হয়। আস্তে-আস্তে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে এ-বিষয়ে লেখা বইপত্র বা অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করি। দিনে-দিনে আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে। আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিসহ আশেপাশের সমস্ত লাইব্রেরিতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে রাখা সমস্ত বইপত্র পড়তে শুরু করি।

'এই করতে-করতে একদিন এই ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকেই আমি দৈবাৎ একটি অতি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজ পাই। তার নাম 'প্র্যাকটিসিং দ্য কাল্ট অফ ডেড অ্যাওকেনিং ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল'। লেখকের নাম অ্যালান জেমস মুর। বইটা তখন আউট অফ অফ প্রিন্ট, বোধহয় লাস্ট কপিটাই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিল।

'এই বইতে জেমস সাহেব একটি অদ্ভুত কথা বলেন। তিনি জানান যে এগারোশো থেকে তেরোশো শতাব্দীর মধ্যে এই বাংলার উত্তরদিশায় এমন একদল গোপন বৌদ্ধতান্ত্রিক দলের জন্ম হয়, যাঁরা নাকি মৃতদের আত্মাকে জাগ্রত করার পদ্ধতি জানতেন। তাঁদের সাধনপদ্ধতি ছিল খুবই মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। এই মৃত আত্মা জাগানোর জন্য তাঁরা এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করদর্শন দেবতার পুজো করতেন।"

"চক্রসম্বর?" প্রশ্ন করল তাপস।

নারানজ্যেঠু সম্মতি দেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় হেলালেন। আমার গা-টা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। আড়চোখে দেখলাম যে গুরুং-ও একটু নড়েচড়ে বসল।

"এই জেমস সাহেব আরও লিখেছেন যে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের এই গোপন দলটি কোনও মূর্তি নয়, একটি পুঁথিকে নিজেদের ইষ্টদেবতা মনে করেন। তাতে চক্রসম্বরের পূজার বিধিমন্ত্র এবং মৃতদের আত্মা জাগ্রত করার পদ্ধতি লেখা আছে। এই পুঁথিটি তাঁদের কাছে এতই পবিত্র যে তাঁরা সেটিকে সদাসর্বদা চোখের মণির মতো রক্ষা করে চলেন। দেখা বা পড়া তো দূরস্থান, তাঁদের সর্বোচ্চ গুরুকে বাদ দিয়ে আর কারও সেই

পবিত্র পুঁথিটি স্পর্শ করার অধিকার অবধি নেই। সেটি রাখাও থাকে একটি অতি সুরক্ষিত জায়গায়। কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ চক্রসাধনার দিনেই সেটিকে বাইরে আনা হয়। এবং এখানেই শেষ নয়, হুইটলার সাহেব আরও একটি অতি ইন্টারেস্টিং কথা লিখেছেন। আর সেটিই এই বইটির গুরুত্ব আমার কাছে বহুদূর বাড়িয়ে দেয়।”

আমরা নড়েচড়ে বসলাম, আমরা কাহিনির মূল খণ্ডে প্রবেশ করছি এবার। নারানজ্যেঠু দু’হাতে মাথার রগ টিপে বসে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ফের বলতে শুরু করলেন তিনি।

“তিনি লিখেছেন যে পুঁথিটির নিরাপত্তার জন্য আটজন বিশিষ্ট বলশালী ও পরাক্রমশালী তান্ত্রিক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা বিষ, ওষধি সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ তো জানতেনই, খালি হাতের মারামারি বা হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট স্কিলেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পুঁথিটিকে রক্ষা করার জন্য এঁরা যেমন অবলীলায় প্রাণ নিতেও পারতেন, তেমন প্রাণ দিতেও পারতেন। এই আটজনকে একত্রে বলা হত অষ্টমহাসিদ্ধ। তাঁরাই ছিলেন পুঁথিটির রক্ষক, কিপার অফ দ্য বুক।”

একটানে এতটা বলে থামলেন নারানজ্যেঠু। সেই সুযোগে প্রশ্ন করল তাপস, “তা এই পুঁথি বা অষ্টমহাসিদ্ধদের ব্যাপারে আর কোনও ইতিহাসবিদ কি কিছু বলেছেন? মানে আর অন্য কোনও রেফারেন্স? আপনি নিজেও তো ওই পিরিয়ডটার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।”

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন জ্যেঠু, “না, এই গোপন তান্ত্রিক গোষ্ঠীর ব্যাপারে আর কোত্থাও কোনও রেফারেন্স নেই। কেন নেই সেটা বলা অবশ্য সহজ, বইটা পড়লেই সেটা বোঝা যায়। জেমস মুর সাহেবের বক্তব্যটাই দাঁড়িয়ে আছে, ‘তোমরা বিশ্বাস করো, পুঁথিটা আমি দেখেছিলাম, আর ওদের সে-সব গোপন কার্যকলাপ আমি স্বচক্ষে দেখেছি’ মার্কা দাবির ওপর, স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। ফলে এইরকম দাবির ওপর ভিত্তি করে কোনও তথ্যকে প্রমাণিত বলে মেনে নেওয়াটা যে-কোনও সুস্থবুদ্ধির ইতিহাসবিদের পক্ষে ইমপসিবল।”

“এটাই কি সেই পুঁথি যেটা নিয়ে আপনাকে হুমকি চিঠি পাঠানো হচ্ছে?” প্রশ্নটা গুরুং-এর।

“হ্যাঁ।” ছোট্ট করে জবাব দিলেন নারানজ্যেঠু। তারপর সামান্য দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, “বলা বাহুল্য, এই বই পড়ামাত্র আমার কৌতূহল চতুর্গুণ বেড়ে যায়। তখন আমি যে শুধু প্রেততত্ত্বে ঘোর বিশ্বাসী তা নয়, সে-নিয়ে প্রেতচক্র ইত্যাদিও বসানো শুরু করেছি। তার ওপর সহজিয়া বাংলায় লেখা ‘চক্রসম্বর সাধনমালা’-র কথা শুনে বাংলার ইতিহাসের ওপর আমার পুরোনো ইন্টারেস্টটা ফিরে আসে। ফলে আমি পূর্ণ উদ্যমে এই পুঁথি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করে দিই।

‘এই নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে-করতে আমার প্রায় মাস-ছয়েক কেটে যায়। সেই সময় প্রায়ই দেখতাম যে আরও এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এসে এই একই বিষয়ে বইপত্র খুঁজছেন বা পড়ছেন। বলা বাহুল্য, দু’জনেরই ইন্টারেস্ট এক বলে আলাপ জমে যেতে দেরি হল না। ইনি ছিলেন বারাসতের কামিনীমোহন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক। ভদ্রলোকের নাম অব্যয়বজ্র দত্ত। নামখানা ভারিক্কি হলে কী হবে, একেবারে মাটির মানুষ আর সেইরকমই পণ্ডিত ব্যক্তি। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে তিনিও অনেকদিন ধরেই গবেষণা করছিলেন।

‘এরকমই কোনও এক সেপ্টেম্বর মাসের বাদলা দিনে আমরা দু’জনে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে গবেষণা করছি, বাইরে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে, সেই সময় এই ভদ্রলোক আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেন।”

*

প্রস্তাবের কথাটা আর জানা হল না, কারণ কোনও নোটিশ না দিয়েই হুড়মুড়িয়ে আমাদের সঙ্গে সকালে আলাপ হওয়া শখের ইতিহাসবিদ দত্তসাহেব এসে হাজির, সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক। দুটো চেয়ার ফাঁকাই রাখা ছিল, তারই একটাতে ধপ করে বসে দত্তসাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এ কী কথা শুনছি নারান, পুলিশ নাকি তোমাকে কোনও একটা খুন হওয়া ভ্যাগাবন্ডের বডি আইডেন্টিফাই করতে ধরে নিয়ে গেসলো? এ-সব কী কাণ্ড, অ্যাঁ! আমি তো গেসলাম বাগডোগরা। ফেরার পথে ম্যালে দেখি মেলা ভিড়, খোঁজখবর করতে গিয়ে শুনি এই ব্যাপার। আমি তো শুনে অবাক! আরে কোথায় কোন ভিখিরির বাচ্চা খুন হয়েছে, আর সে নাকি খুন হওয়ার আগে তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করেছে বলেই তোমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে হবে, অ্যাঁ? আর আজকালকার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোকেও বলিহারি যাই বাবা। কোথা থেকে কতগুলো অপদার্থ এসে জুটেছে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা, শুধুমুধু লোকজনকে হ্যারাস করা।"

"পুলিশ শুধু-শুধু কাউকে হ্যারাস করার জন্য মাইনে পায় না দত্তবাবু।" অন্ধকারের মধ্যেই চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো বলল গুরুং, "আর আমরা মাস্টারসা'বকে গ্রেফতার করিনি, জাস্ট হেল্প করতে বলেছিলাম। আশা করি সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়।"

দত্তবাবু বোধহয় গুরুংকে প্রথমে লক্ষ করেননি। কথাটা শুনে একটু অপ্রস্তুতই হলেন প্রথমে। তবে সেটা মুহূর্তেকের জন্য, পরক্ষণেই তেড়েফুঁড়ে উঠে বললেন, "তাহলে নারানকে নিয়ে এই নাহক টানাহ্যাঁচড়া করার মানেটা কী শুনি? আমার তো রোজই কত লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়, তাদের কারও কিছু হলেই আমাকে দৌড়তে হবে নাকি, অ্যাঁ?"

"হবে বৈ কি।" গম্ভীরমুখে বলল গুরুং, "বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেউ যদি রহস্যজনকভাবে খুন হয়, তাহলে আপনাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করা হতেই পারে, সেটা আমাদের ডিউটির মধ্যেই পড়ে। যদি আপনিই খুন করে থাকেন তাহলে?"

ঝগড়া যে একটা পাকিয়ে উঠছিল সে বলাই বাহুল্য। নারানজ্যেঠু হাঁ-হাঁ করে মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা সামলে নিলেন। দত্তসাহেবকে বললেন, "আরে তেমন কিছু হয়নি দাদা। লোকটা তামাক চাওয়ার অছিলায় গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চাইছিল, পাত্তা দিইনি বলে কেটে পড়ে। আর আমিও বাড়ি চলে আসি। তারপর শুনি এই কাণ্ড। তা পুলিশের কাজ পুলিশ তো করবেই, তাতে আর রাগ করে কী হবে দাদা? আর তাছাড়া গুরুং অতি ভালো ছেলে, আমাকে সে বিন্দুমাত্র অসম্মান করেনি। আপনি আর ও-নিয়ে উত্তেজিত হবেন না প্লিজ।"

কথাটায় কাজ হল, দু'পক্ষই একটু শান্ত হলেন। এ-ও বুঝলাম যে ওই অষ্টমহাসিদ্ধ'র ব্যাপারটা এখানে বলতে চাইছেন না জ্যেঠু। আমরাও ব্যাপারটা চেপে গেলাম।

দত্তসাহেব এবার একটু ঘুরে তাঁর সঙ্গে আসা অতিথির সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, বললেন "যাকগে যাক। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি প্রফেসর যাদব, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রফেসর। এঁর রিসার্চের সাবজেক্ট হচ্ছে ভারতের মধ্যযুগের পুরোনো পুঁথিপত্র। এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় কলকাতা ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে। তার পর থেকে এঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল অনেকদিনই। তা গত চিঠিতে জানতে পারলাম যে ইনি দার্জিলিং ঘুরতে আসছেন। ব্যাস, শোনামাত্র নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ফেলেছি। এঁকে রিসিভ করতেই আজ বাগডোগরা গেসলুম। ফেরার পথে শুনি এই কাণ্ড।"

প্রফেসর যাদব হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমরাও প্রতি নমস্কার করলাম। তারপর আমাদের চমকে দিয়ে প্রফেসর যাদব স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে বললেন, "অনেকদিন বাদে এই চত্বরে এসে বেশ থ্রিলিং লাগছে কিন্তু।

সেই কলেজে পড়ার সময় লাস্ট এসেছিলাম, তারপর এই। ইচ্ছে আছে দিন তিনেক থাকব। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল। আশা করছি এবারের ছুটিটা ভালোই কাটবে।”

আমরা তো থ! দত্তসাহেব দেখি মিটিমিটি হাসছেন, ভাবখানা কেমন সারপ্রাইজ দিলুম! প্রফেসর সাহেব বোধহয় আমাদের অবাক হওয়ার ভাবটা উপভোগ করলেন খানিকক্ষণ, তারপর সহাস্যে বললেন, “আরে দাদা আমি মাণিকতলার ছেলে। বড় হওয়া, পড়াশোনা সবই এখানে। প্রথমে স্কটিশচার্চ, তারপর প্রেসিডেন্সি। বাংলাটা আমি কোনও বাঙালির থেকে খারাপ বলি না।”

আড্ডাটা বেশ জমে গেল। দত্তসাহেবের কথাতেই জানতে পারলাম যে প্রফেসর যাদব ভারতের মধ্যযুগের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। এ-বিষয়ে ইনি দীর্ঘদিন রিসার্চ করছেন, এমনকি বাইরের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে লেকচারও দিয়ে এসেছেন। একই বিষয়ের একজন এক্সপার্টকে পেয়ে জ্যেঠুও বলা বাহুল্য বেশ উৎসাহী হতে উঠলেন।

কথায়-কথায় চক্রসম্বরের পুঁথির কথাটা উঠল। জ্যেঠুর বোধহয় এ-ব্যাপারে বিশদে বলতে খুব এক ইচ্ছে ছিল না। তবুও দত্তসাহেবের পীড়াপীড়িতে বলতেই হল। প্রফেসর যাদব তো পুরো ব্যাপারটা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠলেন, “কী বলছেন কী নারায়ণবাবু! দত্তবাবু আভাস দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু এ-যে রিমার্কেবল আবিষ্কার, বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ইতিহাসটাই পালটে যাবে ! ইতিহাসে আপনার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে যে মশাই।”

দত্তবাবু বেশ প্রসন্ন হাসি হাসলেন, “কী প্রফেসর সাহেব, কী বলেছিলাম আপনাকে? একটা সারপ্রাইজ দেব বলিনি?”

অন্ধকারেও দেখলাম প্রফেসর যাদবের চোখ বেশ জ্বলজ্বল করছে। তিনি একটু ঝুঁকে এসে প্রশ্ন করলেন, “পুঁথিটা একবার দেখা যায়?”

জ্যেঠু সবিনয়ে জানালেন যে পুঁথিটা উনি কাউকেই দেখাচ্ছেন না। তার কারণটাও সবিস্তারে বলতে হল। এমনকি হুমকি চিঠিটার কথাও উঠল। প্রফেসর যাদব ও-সব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, “এই লাইনে এ-সব উটকো চিঠিফিঠি এসেই থাকে দাদা। ও-সবে ভয় করলে চলে? এই তো দেখুন না, আমার কাছেই ফোনে বা চিঠিতে কতশত প্রলোভন বা হুমকি আসে। তার একটাকেও কি আমি পাত্তা দিই? দিই না। আমার কথা শুনুন, আপনিও এ-সবে একদম পাত্তা দেবেন না। আমার মনে হয় না আপনার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ আছে বলে।”

নারানজ্যেঠু কিছু বলার আগেই প্রশ্নটা করল গুরুং, “কেন, আপনার কাছে হুমকি বা প্রলোভন আসে কেন?”

এই প্রথম আমি কাউকে শব্দ না করে হা-হা করে হাসতে দেখলাম। সেই হাসি দেখে জানি না কেন আমার গা-টা শিরশির করে উঠল।

হাসি থামলে পর প্রফেসর যাদব বললেন, “আপনারা প্রায়ই শোনেন না যে গাঁও দেহাতে কারও বাড়িতে, অথবা কোনও পুরোনো জমিন্দার হাভেলির লাইব্রেরি বা দলিল দস্তাবেজের মধ্যে পুরোনো পুঁথি খুঁজে পাওয়া গেছে? মাঝে-মাঝেই লোকে তাদের বাপ-দাদার জমানার পুঁথিপত্র খুঁজে পায়। তো আজকাল এ-সব কেউ নিজের হাতে রাখে না। রেখে করবেটাই বা কী? অনেকেই আমাদের কাছে, মানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে দিয়ে যান। আর যদি পরিবারে চালাক-চতুর কেউ থাকে, তাহলে সে এ-সব পেলেই বেচে দেওয়ার ধান্ধা করে, যদি হাতে কিছু কাঁচা টাকা আসে সেই ভেবে।”

“কিন্তু এ-সব কেনে কারা?” বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর যাদব। তবুও তাঁর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা বাঁকা হাসিটা এই অন্ধকারের মধ্যেও আমার নজর এড়াল না। উনি বললেন, “কেনার লোকের কি অভাব আছে দাদা? জানি না আপনারা জানেন কি না, এ-সব পুরোনো পুঁথির ভালো ডিমান্ড আছে বিদেশি কালেক্টরদের কাছে। আর তেমন-তেমন হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিক্যান্স থাকলে এ-সব পুঁথির দাম কোটিখানেক হওয়াও বিচিত্র নয়।”

“কিন্তু তাতে আপনার কাছে ধমকি চিঠি আসার কারণটা কী?” গুরুংয়ের দিক থেকে প্রশ্নটা তিরের মতো ধেয়ে এল।

“মুশকিল হচ্ছে যে এই সার্কিটে জাল পুঁথিও ঘুরে বেড়ায় খুব বেশি। পুঁথি জাল করাও অতি উচ্চদরের আর্ট, সে-নিয়ে আপনাদের জ্ঞান না-হয় পরে একদিন দেব। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, যে-সব বিদেশি কালেক্টররা গাদাগুচ্ছের ডলার ঢেলে এ-সব কেনেন, তার অথেন্টিসিটি তাঁরা একেবারে বাজিয়ে দেখে নেন। তাঁরা আবার যেমন তেমন লোকের সার্টিফিকেশন নিয়ে সন্তুষ্ট হন না, এই সার্কিটে সার্টিফায়ার হিসেবে নাম আছে, একমাত্র তাঁদের অথেন্টিকেশনটাই চাই।

‘হয়তো অহঙ্কারের মতো শোনাবে, তবুও বলি যে ভারতের মধ্যযুগের পুঁথিপত্রের ব্যাপারে আমার থেকে বেশি জানকারিওয়ালা লোক এই দেশে খুব বেশি নেই। এই লাইনে এক্সপার্ট হিসেবে আমার কিছু সুনাম আছে। ফলে এই কারবারের জগতে আমার দেওয়া সার্টিফিকেটের যে কিছু মূল্য থাকবে সে আর বিচিত্র কী? তাই আমার কাছে হামেশাই প্রচুর পুরোনো পুঁথি আসে অথেন্টিকেশনের জন্য। আপনাদের বলতে বাধা নেই, সেই সুবাদে আমার কিছু আয়ও হয়, তার পরিমাণ কিছু কম না। ফলে বুঝতেই পারছেন যে কাজটা কতটা ঝুঁকির। তো আমার কাছে থ্রেটনিং চিঠি আসবে না তো কার কাছে আসবে বলুন?”

কথা শেষ হওয়া মাত্র একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল গুরুং, “এ-সব পুঁথিপত্র দেশের বাইরে চালান করাটা বেআইনি না?”

প্রথমে সরু একটা চাউনি যেন লক্ষ করলাম প্রফেসর যাদবের চোখে। তবে সেটা সামলে নিয়েই বললেন তিনি, “কিছু পুঁথিপত্র বাইরে চালান করা অবশ্যই বেআইনি, বিশেষ করে ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন পুঁথি। তবে সে-সবে আমি নিজেকে বিলকুল জড়াই না, জানা-মাত্র হাত উঠিয়ে নিই। আর আমার কাছে তো আর বায়ার, মানে ক্রেতারা সরাসরি আসেন না, পুরো ডিলটাই হয় দালালের মাধ্যমে। এখন সে যদি এসে বলে যে সে শখের ইতিহাসবিদ, বা কোনও কলেজের প্রফেসর, তাহলে আমার আর কী-ই বা করার থাকে বলুন? ব্যাপারটাকে আমি তখন প্রফেশনালি দেখি। একহাতে সার্টিফিকেট দিই, আরেক হাতে টাকা নিই।”

উত্তরটা মনে হয় সন্তুষ্ট করল না গুরুংকে। ভুরু কুঁচকে কী যেন একটা ভাবতে লাগল।

এই সুযোগে দত্তসাহেব জ্যেঠুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে পুঁথিটার ব্যাপারে কী ঠিক করলে নারান?”

“আপাতত আমার কাছেই এনে রেখেছি দাদা। গুরুং আপাতত একটা সিকিউরিটির জন্য লোক দেবে বলেছে। কালই ও-জিনিস আমি অন্য কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। এমনিতেও পুঁথিটা আমার প্রায় পুরোটাই কপি করা হয়ে গেছে। এবার ওটা হাতে রেখে কোনও লাভ নেই।”

দত্তসাহেব কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আর শোনা হল না, কারণ ঠিক তখনই লোবসাম এসে খবর দিল যে গুরুংয়ের ড্রাইভার বলছে একবার বড়াসা'বকে থানায় যেতে হবে এক্ষুনি, ওই তাশি দোরজের ব্যাপারে কী-একটা খবর এসেছে। গুরুং শোনা-মাত্র উঠে পড়ল, শুধু যাওয়ার আগে বলে গেল যেন পরের কয়েকটা দিন জ্যেঠু দার্জিলিংয়ের বাইরে না যান, তাতে ওর তদন্তের অসুবিধা হবে। জ্যেঠু লোবসামকেই বললেন গুরুংকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে।

ওরা বেরোতেই প্রফেসর যাদব আরও ঝুঁকে এলেন জ্যেঠুর দিকে, বললেন, "আমি দার্জিলিং থেকে চলে যাওয়ার আগে কপিটা অন্তত একবার আমাকে দেখাবেন তো?"

নারানজ্যেঠু একটু কুণ্ঠিতস্বরে বললেন, "আরে এ-রকম করে বলছেন কেন প্রফেসর। আপনি এই বিষয়ে একজন এক্সপার্ট, আপনাকে একবার না দেখালে আমার চলবে?"

প্রফেসর যাদব উঠে পড়লেন, দেখাদেখি দত্তসাহেবও। যাওয়ার আগে হ্যান্ডশেক করে শুধু একটা কথাই বললেন প্রফেসর যাদব, "আমাকে প্রফেসর বলে ডাকবেন না দাদা, আমি আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট, আমাকে যোগেন্দ্র বলে ডাকবেন। দত্তবাবুও আমাকে নাম ধরেই ডাকেন।" জ্যেঠু একগাল হেসে বললেন, "তথাস্তু।"

সেদিন রাতে শোওয়ার সময় দেখি তাপস বিছানায় শুয়ে ভয়ানক ভাবে ভুরু কুঁচকে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একবার-দু'বার ডেকে দেখলাম সাড়া দিচ্ছে না। শেষে কাছে গিয়ে পেটে একটা খোঁচা দিতে আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি বললাম, "কী রে, কী এত উথাল-পাতাল ভাবছিস?"

অন্যমনস্ক ভাবে তাপস বলল, "কতগুলো খটকা মনের মধ্যে জেগে আছে রে। সলভ করতে পারছি না।"

"যেমন?"

"এই যেমন ধর দেবাশিস বণিক মশাই। প্রথম দিন উনি যখন গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে চা আর ম্যাগি খাচ্ছিলেন, ওঁর জুতোটা ভালো করে লক্ষ করেছিলি?"

মাথা নাড়লাম। খামোখা আমি একটা লোকের জুতো লক্ষই বা করতে যাব কেন?

"যে লোকটা এয়ারপোর্টে নেমে সোজা গাড়ি ধরে দার্জিলিং যাচ্ছে, তার জুতোতে অত ফার্ন আর কাদা লেগে থাকবে কেন? আর সাধারণ একজন কিউরিও শপের মালিক মিলিটারি গ্রেড জুতো পরবেই বা কেন?"

"তুই ঠিক জানিস ওটা মিলিটারির জুতো?"

"একদম সেন্ট পার্সেন্ট শিওর। শুধু কি তাই? খটকা আরও আছে। যেমন ধর ওই তাশি দোরজে, মানে যে লোকটা খুন হয়েছে, সে যে খুন হওয়ার আগে জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করেছে, সেটা গুরুং জানল কী করে?"

"না জানার কী আছে? বোকার মতো কথা বলছিস।" এবার প্রতিবাদ করতেই হল, "ওরা পুলিশ, ওরা জানবে না?"

আমার দিকে ত্যারচা চোখে তাকাল তাপস, "সে আর জানবে না কেন। তাই বলে অত তাড়াতাড়ি? লোকটা যখন জ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলছে তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। তারপর আমরা চলে এলাম। গুরুং এল দুপুর আড়াইটে নাগাদ। ততক্ষণে ওর কাছে খবর চলে এসেছে যে একটা লোক ড্যাফোডিল লজে খুন হয়েছে, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু তখনও ও ডেডবডি দেখেনি, অথচ খুন হওয়ার আগে ওই লোকটা যে জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করেছে সে-খবরটা ও জানল কী করে?"

"কী করে জানলি তুই যে ও ডেডবডিটা আগে না দেখেই জ্যেঠুকে নিয়ে যেতে এসেছে?" চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম।

তাপস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "নাহ্, কাকিমা ঠিকই বলেন। ব্যায়াম করে করে তোর সব বুদ্ধি হাঁটুতে গিয়ে জমা হয়েছে। শুনলি না লজের ম্যানেজারকে গুরুং জিজ্ঞেস করল খুনটা কোথায় কোন রুমে হয়েছে? আগে গিয়ে দেখে এলে কি আর প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করত?"

অকাট্য যুক্তি। ফলে মনে মনে বেজায় চটে গেলেও খোঁচাটা চুপচাপ হজম করে নিলাম। তবে তর্ক করতে ছাড়লাম না, "ওদের তো চর আছে এদিক-ওদিক। তারাই নিশ্চয়ই জানিয়েছে। পুলিশের সোর্স থাকে শুনিসনি?"

আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল তাপস তাপস, "না শোনার কী আছে? কিন্তু দার্জিলিং পুলিশ কি সব্বার ওপরে স্পাইগিরি করে বেড়ায়? নিশ্চয়ই না। তাহলে পুলিশের স্পাই এত তাড়াতাড়ি কী করে জানল যে এই তাশি দোরজে মারা যাওয়ার আগে জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করেছে?"

"তার মানে নিশ্চয়ই স্পাই বা পুলিশ ওর ওপর আগে থেকেই নজর রাখছিল।"

"এই তো বুদ্ধিটা হাঁটু থেকে কোমর অবধি উঠে এসেছে দেখছি। তা বাপু এবার কিডনি খাটিয়ে বলো দেখি পুলিশের লোক কাদের ওপরে সবসময় নজর রাখে?"

"কেন, কোনও সাসপেক্ট বা ক্রিমিনালদের ওপরে।" সদর্পে বললাম আমি। আর বলেই বুঝলাম কী বলে ফেলেছি!

আমার মুখের অবস্থা দেখে বোধহয় দয়া হল তাপসের, আমাকে আর ঘাঁটাল না সে। দেখি ও শোয়া অবস্থা থেকে উঠে, একটা বালিশ বুকে চেপে ধরে বসে আছে। মাথার ওপরে একটা ষাট পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল, সেই বাল্বের অল্প দুলুনিতে আমাদের ছায়া পড়ছিল মেঝেতে। সেদিকে তাকিয়ে ভারি অন্যমনস্ক স্বরে বলল তাপস, "কিন্তু আসল খটকাটা অন্য জায়গায়, বুঝলি। আজ সারাদিন যা কথাবার্তা শুনেছি, তাতে কেউ একজন এমন একটা কথা বলেছে যা লজিক্যালি কারেক্ট হতে পারে না। মানে ধর ওই কালীপুজোর রাতে নদীর চরে জ্যোৎস্নায় দেখার মতো বা গুড ফ্রাইডের ছুটি রোববারে পড়ার মতো একটা কথা, যেটা হওয়া অসম্ভব। মুশকিল হচ্ছে যে, খটকাটা মাথার মধ্যে বিঁধে আছে বটে, কিন্তু কে যে কখন কী বলল সেটা বুঝতেই পারছি না। অস্বস্তিটা মনের মধ্যে বড়ই জ্বালাচ্ছে রে।"

আমার আর কথা শোনা হল না। কারণ ততক্ষণে আমার দু'চোখ জুড়িয়ে আসছে। আমি আমার বিছানায় গিয়ে শোয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আসল ঘটনা শুরু হল পরের দিন ঠিক সকাল থেকে।

*

সকালে ঘুমটা ভাঙল তাপসের ঘন-ঘন ঝাঁকানিতে। চোখ খুলতেই ও রুদ্ধশ্বাসে বলল, "জলদি ওঠ সুবোধ, সর্বনাশ হয়ে গেছে। জ্যেঠুর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, লোবসামও উধাও। তাড়াতাড়ি ওঠ, থানায় যেতে হবে।"

ব্যাপারটা বুঝতেই আমার খানিকক্ষণ লাগল। তারপর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম, "মানে? জ্যেঠুর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না মানে?"

দ্রুতবেগে জামা প্যান্ট পরতে-পরতে তাপস বলল, "সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার সময় দেখি জ্যেঠুর স্নিকার্সদুটো বাইরে রাখা। তখনই বুঝেছি যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। খুব শরীর খারাপ না হলে জ্যেঠু কখ্‌খনো মর্নিং ওয়াকটা মিস করেন না। জ্যেঠুকে ডাকতে গিয়ে দেখি দরজা হাট করে খোলা, জ্যেঠু নেই। আর সারা ঘর লন্ডভন্ড হয়ে আছে। লোবসামের নাম ধরে ডেকে-ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন ওর ঘরে গিয়ে দেখি ওর ঘরও ফাঁকা। আলনায় ঝুলতে থাকা কয়েকটা পুরোনো জামা ছাড়া আর কিছুই নেই।"

তখনও আমার হতভম্ব ভাবটা কাটেনি। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে অ্যাকশনের সময় এসে গেছে। বাথরুমে ঢুকে পড়া থেকে শুরু করে তৈরি হওয়া অবধি সব মিলিয়ে আমার সময় লাগল দশ মিনিটের মতো। যাওয়ার আগে একবার জ্যেঠুর বেডরুমে উঁকি দিয়ে এলাম। মনে হল ঘরের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেছে। বাকিটা আর দেখতে সাহস হল না।

বাড়ির দরজা, গ্যারাজ আর গাড়ির চাবি থাকত ডাইনিং রুমের পাশে রাখা একটা কাঠের ক্যাবিনেটের মধ্যে। সেটা টেনে দেখলাম বাড়ির চাবি-সহ সবই আছে, নেই শুধু গাড়ির চাবিটা। মানে যারা এই কাণ্ড করেছে তারা কী-ভাবে আমাদের চলাফেরায় অসুবিধা সৃষ্টি করা যায় সেটাও খুঁটিয়ে ভেবেছে। আর গাড়ির চাবি কোথায় থাকে সেটা যখন ওরা জানে তখন সন্দেহের তির একজনের দিকেই ঘুরে যায়, লোবসাম।

বাড়ির দরজা তালাবন্ধ করে নীচে নামলাম। জ্যেঠুর বাড়ির সামনে ফুলের কেয়ারি করা বাগান, আর বাগান পেরোলেই কাঠের বেড়া দেওয়া একটা গেট। গেটটা একটা সরু রাস্তার পাশে, রাস্তার ওপাশে খাদ। রাস্তাটা ধরে পুবমুখো কয়েকশো মিটার নেমে গেলে বড় রাস্তা। আমরা বাগানের কাঠের বেড়ার দরজাটা খুলে রাস্তায় পড়েই বাঁ-দিক ধরে সোজা দৌড় দিলাম। যদিও সেটা খুব একটা সহজ হল না। একে খাদের ধার থেকে উঠে আসা আশ্বিনের কুয়াশায় তখন রাস্তার কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারপর রাতভর শিশির পড়েছে বলে রাস্তাটাও পেছল হয়ে ছিল। তারই মধ্যে কোনওমতে আধা হেঁটে, আধা দৌড়ে আমরা বড় রাস্তায় পৌঁছোলাম। মোটা জ্যাকেট আর জিন্স্ পরে থাকা সত্ত্বেও সে-সব ভেদ করে বরফের ছুরির মতো ঠান্ডা আমাদের হাড়-মজ্জা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

সদ্য জেগে ওঠা লেবং টাউন তখন বড় রাস্তা ধরে যাতায়াত শুরু করেছে। কুয়াশার মধ্যেই দেখা যাচ্ছিল কাজে বেরিয়ে পড়া মানুষজনের দল। পুবদিকের আকাশে সোনালি রঙ ধরেছে সবে। আশপাশের দৃশ্য ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল, যেন কোনও দৈত্য তার মস্ত হাত দিয়ে রাস্তার ওপর জমে থাকা কুয়াশার চাদর দ্রুত টেনে নিচ্ছিল খাদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের তখন সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় নেই। বুকের ভেতরে কে যেন একটা হাতুড়ি পিটছে, গলার কাছটা শুকনো।

একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখলাম একটা ছোট গাড়ি আসছে এদিকে। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। তারপর তাকে পটিয়ে-পাটিয়ে থানা পৌঁছতে লাগল মিনিট-চল্লিশেক।

থানায় তখনও দিনের কাজ-কারবার শুরু হয়নি। আমাদের হাঁকাহাঁকিতে খুবই বিরক্ত মুখে যে কনস্টেবল বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখামাত্র চিনতে পারলাম। ড্যাফোডিলে যাওয়ার পথে যে-দু'জন কনস্টেবল আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। আমাদের দেখামাত্র অবশ্য ভদ্রলোকের মুখের ভাব বদলে গেল। তাপস পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে সময় নিল ঠিক পাঁচ মিনিট। আর তারপর ঝটপট গুরুংয়ের বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

যেতে-যেতে একটা প্রশ্নই করলাম তাপসকে, "ওরা জ্যেঠুকে মেরে ফেলেনি তো?" বলতে-বলতেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, সেটা যতটা না ঠান্ডার জন্য, তার থেকেও বেশি ভয়ে।

তাপস দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "খুব সম্ভবত নয়। কারণ আমার মন বলছে যে পুঁথিটা ওরা পায়নি। তবে ওরা জানতে পেরেছে যে পুঁথিটা জ্যেঠু বাড়িতে এনে রেখেছেন, আর আজই সেটা ওদের হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করছে ওরা। আমার মনে হয় জ্যেঠুকে আটকে রেখে ওরা পুঁথিটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে। জ্যেঠু ঠিকই বলেছিলেন, পুঁথিটাই ওঁর লাইফ ইনশিওরেন্স। যতক্ষণ ওরা ওটার খোঁজ না পায়, ততক্ষণ জ্যেঠুকে ওরা কিছু করবে না।"

"কিন্তু ওরা কারা? সেই অষ্টমহাসিদ্ধ না কাদের কথা বললেন জ্যেঠু, ওরা?"

"সেটা ঠিক করে বলা মুশকিল সুবোধ।" গম্ভীরস্বরে বলল তাপস, "কারণ এখনও অবধি এই পুরো ব্যাপারটায় একটা মস্তবড় ফাঁক থেকে গেছে। সেটা হচ্ছে যে কী করে পুঁথিটা জ্যেঠুর হাতে এল, সেটার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। শুধু তা-ই নয়, কে এই তাশি দোরজে, কেনই বা সে জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করল আর কেনই বা কেউ তাকে খুন করল, সে-সব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"গুরুং কিছু হেল্প করতে পারবে না?"

বিরক্ত হল তাপস, "গুরুং না পারলে আর কে পারবে শুনি? পুলিশ পারে না হেন কাজ নেই। ওরা তো তাশি দোরজের খুনের তদন্ত করছেই। এবার তার সঙ্গে জ্যেঠুর উধাও হওয়াটা যোগ হল। তবে দুটো একই লোকের কাজ কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। কেসটা যে এবার যথেষ্ট প্যাঁচালো হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।"

"আর লোবসাম?"

"সে-ই তো পাণ্ডাদের চর রে সুবোধ। সন্দেহ যে আমার একটা হয়নি তা নয়।" চলতে-চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাপস, "প্রথম দিন যখন দত্তসাহেব এসেছিলেন আর পুঁথিটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল, একবারের জন্য আমার মনে হয়েছিল ছাদের দরজার আড়ালে কেউ যেন একজন দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। লোবসাম ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু ছেলেটাকে অমন নিরীহ দেখতে বলে সে-নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি, ভেবেছি আমার মনের ভুল। ইশ্, ছেলেটাকে যদি একটু নজরে-নজরে রাখতাম।"

গুরুংয়ের বাড়ির সামনে আসতে আমাদের বেশিক্ষণ লাগল না। গুরুং তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, পরনে ইউনিফর্ম নয়, ঘরোয়া পোষাক। আমাদের দেখে খানিকটা অবাক হল সে। তারপর দ্রুত নেমে এল বারান্দা থেকে, "আরে! কী ব্যাপার? আপনারা? কী হয়েছে?"

ঠিক চারটে বাক্যে জ্যেঠুর আর লোবসামের উধাও হওয়ার খবরটা দিল তাপস। শোনামাত্র গুরুং দৌড়ে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে যখন ও বাইরে এল তখন ওর পরনে পুরোদস্তুর পুলিশি পোষাক। ওর জিপটা বাড়ির পাশেই রাখা ছিল। চারজনে জিপে উঠতেই জিপ ছুটল জ্যেঠুর বাংলোর দিকে।

যেতে-যেতে শুধু একটাই প্রশ্ন করল গুরুং, "আর ইউ শিওর দ্যাট হি হ্যাজ বিন অ্যাবডাক্টেড? হঠাৎ করে কোথাও চলে জাননি তো?"

"অসম্ভব, প্রশ্নই ওঠে না। জুতো, ঘড়ি, মানিব্যাগ, রিডিং গ্লাস -সব পড়ে আছে। যত আর্জেন্ট কাজই হোক, কাউকে কিছু না বলে, স্রেফ রাতপোষাক পরে একটা লোক বেরিয়ে যাবে?"

তাপসের যুক্তিটা অকাট্য। গুরুং বোধহয় সেই জন্যই আর কোনও প্রশ্ন করল না।

জ্যেঠুর বাংলোর সামনে যখন আমরা নামছি, তখন বাজে সকাল ন'টা পঁয়তাল্লিশ। নামতেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন দত্তসাহেব আর প্রফেসর যাদব। আমাদের তিনজনকে হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসতে দেখে তাঁরা বুঝে গেলেন কিছু একটা হয়েছে। প্রশ্নটা দত্তসাহেবই করলেন, "কী ব্যাপার সুবোধ? তোমরা গেছিলে কোথায়? ঘরে কেউ নেই? নারান কোথায়? লোবসামকেই বা ডেকে ডেকে পাচ্ছি না কেন?"

"জ্যেঠুকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, দত্তবাবু।" শান্তস্বরে কথাটা বলল তাপস, "সঙ্গে লোবসামও উধাও।"

দত্তসাহেবের মুখটা হাঁ হয়ে গেল, একই অবস্থা প্রফেসর যাদবেরও। স্খলিতস্বরে প্রফেসর যাদব বললেন, "অ্যাঁ? সে কী? নারায়ণবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে? কারা? কেন? কী করে?"

ততক্ষণে আমরা তিনজনে ঢুকে পড়েছি বাড়ির মধ্যে, পেছনে-পেছনে কনস্টেবল আর প্রফেসর যাদবকে নিয়ে দত্তসাহেব। হাঁটতে-হাঁটতেই জবাব দিল তাপস, "কেন নিয়ে গেছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কারা আর কী করে নিয়ে গেছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।"

"এমন হতে পারে না যে নারান হঠাৎ করে কোনও আর্জেন্ট কাজে কাউকে না বলে বেরিয়ে গেছে?" উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন দত্তসাহেব।

গুরুংকে দেওয়া উত্তরটাই আবার রিপিট করল তাপস। দত্তবাবু চুপ করে গেলেন। ততক্ষণে আমরা জ্যেঠুর বেডরুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

ঘরটা দেখেলেই বোঝা যায় যে সারা ঘর লন্ডভন্ড করে কিছু খুঁজেছে কেউ। বিছানার চাদর হাঁটকানো, ওয়ার্ড্রোব খোলা, অর্ধেক জামাকাপড় নীচে পড়ে লুটোচ্ছে। বেডসাইড টেবলে একটা নাইট ল্যাম্প ছিল, সেটাও মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের কোনার দিকে একটা গোদরেজের আলমারি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাল্লাদুটো হাট করে খোলা, লকারটাও। আলমারির মধ্যেকার প্রতিটা জিনিস মাটিতে ফেলে রাখা। একটা হাল্কা মিষ্টি গন্ধও নাকে এল। তাপস চাপাস্বরে বলল, "ক্লোরোফর্ম।"

গুরুং আমাদের বাইরে দাঁড়াতে বলে টিপ-টো করে ঘরের মধ্যে গেল একবার। চারিদিক ঘুরে দেখল। তারপর বাইরে এসে বলল, "ঘরটা সিল করতে হবে। আপনারা কেউ ঘরে ঢুকবেন না, বা দরজার পাল্লায় বা কোথাও হাত দেবেন না, যতক্ষণ না ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট আসছেন। বাকি ঘরগুলোও একবার দেখব।"

বাকি ঘর বলতে আমাদের শোওয়ার ঘর আর আরেকটা গেস্টরুম। সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। ফলে সবাই হাঁটা দিলাম দোতলায়।

দোতলা থেকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জের একটা দুর্দান্ত ভালো ভিউ পাওয়া যায় সে তো আগেই বলেছি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম খাদের গা বেয়ে যাওয়া-আসা করছে বিভিন্ন প্যাসেঞ্জার গাড়ি। এখান থেকে

প্রায় খেলনার মতো দেখাচ্ছে। অন্যদিন হলে এইখানেই বসে আড্ডা মেরে পুরো দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আজকে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার কথা নয়।

সবাই এসে দাঁড়ালাম জ্যেঠুর লাইব্রেরির সামনে। এর দরজা খোলাই থাকে। প্রথম দিন যখন আসি, জ্যেঠুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এতে তালা দেওয়া হয় না কেন। তাতে উনি বলেছিলেন, যদি কোনও চোর এখান থেকে বই চুরি করতে আসে, তবে লেবংয়ে বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আছে এমন লোক আছে জেনে উনি খুবই আনন্দ পাবেন।

দরজাটা ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল। ভেতরে সার-সার বইয়ের র‍্যাক। পুবদিকের দেওয়ালজোড়া মস্ত-মস্ত কাচের জানালা, তাতে সারা ঘর আলোময় হয়ে আছে। মাঝের জানালার সামনেই একটা গদিআঁটা আরামকেদারা, তার সামনে একটা নিচু পা-দানি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওইটি জ্যেঠুর পড়ার জায়গা।

আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে পুরো লাইব্রেরিটা প্রথম দিন যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনই আছে। মানে জ্যেঠুর শোওয়ার ঘর যেমন লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে, এখানে সেই তাণ্ডবের চিহ্নমাত্র নেই।

আমার মনের প্রশ্নটা দত্তসাহেবই করে ফেললেন, "এ কী, ওরা তো মনে হচ্ছে এখানে ঢোকেইনি। এটা কী-রকম হল?"

"খুবই স্বাভাবিক।" বলল গুরুং, "যারা এসেছিল তারা জানত যে অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাস্টারসা'ব সবার চোখের সামনে ফেলে রাখবেন না, নিজের কাছেই রাখবেন। তাই ওরা ওঁর শোওয়ার ঘরটাই টার্গেট করেছিল। চলুন তাপসবাবু, লোবসামের ঘরটা দেখান একবার।"

আমরা দোতলা থেকে নেমে এসে মেজানাইন ফ্লোরে এসে দাঁড়ালাম।

জ্যেঠুর বাংলোর একতলায় তিনটে শোওয়ার ঘর, কিচেন, ডাইনিং স্পেস আর ড্রয়িংরুম। শোওয়ার ঘর তিনটে একটা বড় টানা বারান্দার একপাশে। বারান্দাটা শুরু হওয়ার মুখেই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়িটা একতলা থেকে দোতলায় ওঠার বাঁকের মুখে মেজানাইন ফ্লোরে একটা ছোট ঘর। লোবসাম থাকতো এখানেই।

ঘরটা একটু নিচু, সিলিং সাত ফিটের বেশি হবে না। নিরাভরণ ঘর। দেওয়ালের একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। খাটের পাশে একটা ছোট কাঠের আলমারি আর একটা আলনা। খাটের নীচে একটা ট্রাঙ্ক রাখা। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে একটা জানলা, সেখান দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছিল।

আমি, তাপস আর গুরুং মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলাম। যদিও দেখার বিশেষ কিছু ছিল না। জুতো জামা তোয়ালে কিচ্ছুটি নেই। শুধু আলনায় দুটো পুরোনো জামা আর প্যান্ট ঝুলছে।

"হুঁ, পাখি নিজের সব জিনিসপত্র নিয়েই উড়েছেন দেখছি। তার মানে প্রিপারেশন গোপনে-গোপনে অনেকদিন ধরেই নিচ্ছিলেন ইনি।" গম্ভীরমুখে বলল গুরুং। তারপর প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এই লোবসামের বাড়ি-ঘরদোর কোথায় জানেন আপনারা?"

প্রশ্নটা শোনামাত্র দত্তসাহেবের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। আমারও মনে পড়ে গেল যে জ্যেঠু বলেছিলেন এই দত্তসাহেবের ড্রাইভার কাম কাজের লোক বীরেন্দ্র থাপা হচ্ছে এই লোবসামের কাকা। লোবসাম এই বাড়িতে বহাল হয় তাঁরই সুপারিশে।

কথাটা শুনে গুরুংয়ের মুখটা হল দেখবার মতো। একটা চাপা বাঘাটে স্বরে গর্জন করে উঠল সে, "থাপা-র ভাইপো লোবসাম? আপনি কি ইয়ার্কি করছেন দত্তবাবু?"

ধমকটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেও একটু পরে নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পেলেন প্রাক্তন দুঁদে সরকারী আমলা দত্তসাহেব, "কেন, এতে ইয়ার্কি করার কী আছে? আর আপনার সঙ্গে আমার ইয়ার্কি করার শখই বা হবে কেন?"

"কারণ বীরেন্দ্র-র সারনেম থাপা, অর্থাৎ ও নেপালি। আর লোবসাম হচ্ছে খাঁটি তিব্বতি নাম। এবার বলুন তো দত্তসাহেব, নেপালির ভাইপো টিবেটান হয় কী করে?"

দত্তবাবু কেন, আমরাও হাঁ-করে চেয়ে রইলাম গুরুং-এর দিকে। কথাটা আমাদের মাথাতেই আসেনি।

গুরুং গম্ভীর মুখে বলল, "কিছু মনে করবেন না দত্তবাবু, আপনাকে আর আপনার বীরেন্দ্রকে জেরা করার জন্য একটু থানায় নিয়ে যেতে হচ্ছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ। এমনকি যোগেন্দ্রজি চাইলে তিনিও আসতে পারেন।"

প্রফেসর যাদব স্থিরস্বরে বললেন, "আমি তো যাবই। ইন ফ্যাক্ট পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। জেএনইউ-র প্রফেসর হওয়ার সুবাদে সরকারি লেভেলে আমার কন্ট্যাক্ট খুব একটা কম নয়। আমি সে-সবও অ্যাক্টিভেট করছি।"

কথাটা যে গুরুংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মতো তাতে সন্দেহ নেই। দেখলাম যে দারোগাসাহেবের মুখটা মুহূর্তে রক্তবর্ণ ধারণ করল। আর একটা কথাও না বলে অ্যাবাউট টার্ন করে বাইরের দিকে হাঁটা দিল গুরুং।

ওঁরা চলে যেতেই তাপসের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। আমাকে বলল, "একটা কাজ কর সুবোধ। জ্যেঠুর লাইব্রেরিটা নাড়াঘাঁটা করে দেখ কাজের কিছু খুঁজে পাস কি না। আমার মন বলছে ওখানে কিছু একটা পাওয়া যাবেই। আমি কতগুলো কাজ সেরে দুপুর নাগাদ ফিরছি। লাঞ্চ তোর আর আমার জন্য প্যাক করিয়ে নিয়ে আসব, সে-নিয়ে চিন্তা করিস না, আর আমি না ফেরা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে কোত্থাও যাবি না।"

আমার বুকের মধ্যে ড্রাম বাজতে লাগল। তাপসের এই ব্যস্ততার কারণ আমি জানি। আমাদের আগেকার অনেক অভিযানে তাপসকে দেখেছি রহস্য সমাধানের একটা সূত্র পেলে এইভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠতে। শুধু একটাই প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু লাইব্রেরিতে কি কিছু পাওয়া যাবে? মানে গুরুং বলে গেল না যে জ্যেঠু নিশ্চয়ই এখানে পুঁথিটা লুকিয়ে রাখেননি?"

তাপসের ঠোঁটের কোণে ওর সেই চিরচেনা চাপা হাসিটা ফিরে এল, "গুরুং-ও সেই ভাবেই ভেবেছে যে-ভাবে একজন ক্রিমিনাল ভাববে। এখন ভাব তো, যদি নারানজ্যেঠু ক্রিমিনাল আর দারোগাদের থেকে একটু বেশি ভাবেন? মানে উনি যদি ওরা এইরকম ভাবেই ভাববে সেটা আন্দাজ করে এখানেই কিছু লুকিয়ে রাখেন?"

সকাল থেকে তো ডিস্টার্বড ছিলামই, এবার অন্যরা কী-রকম ভাববে ভেবে কেউ নিজের ভাবাভাবির পদ্ধতি ভাবছেন ভেবেই মাথাটা স্রেফ আউলে গেল। এ-সব কী বলছে কী তপু?

আমাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল তাপস। শুধু বলে গেল, লাইব্রেরির একটা ইঞ্চিও যেন আমি খোঁজাখুঁজি করতে বাদ না দিই।

তাপস চলে যেতেই একটা অদ্ভুত ভয়-লাগানো নৈঃশব্দ্য আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ঘড়িতে তখন প্রায় বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, সূর্য মধ্যগগনে। এই পাহাড়ের বুক ছেয়ে থাকা উপত্যকা আর উপত্যকার গা বেয়ে চলা বাতাসের শিরশিরে আওয়াজ আমাকে ক্ষণে-ক্ষণে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে আমি একেবারে একলা।

তাপস নেমে যেতেই আমি একবার নীচে গিয়ে সদর দরজার ল্যাচটা লাগিয়ে এলাম। তারপর ঘুরে একবার ড্রয়িং স্পেসের দিকে তাকালাম।

কেউ নেই।

ঘাড় না ঘুরিয়েই আমি একবার আড়চোখে ব্যালকনির দিকে তাকালাম। একটা শুকনো হাওয়া যেন কোথা থেকে উড়ে এসে বারান্দার মেঝেতে পাক খেতে থাকল।

আমার আর একা থাকা পোষাল না। একদৌড়ে দোতলায় নারানজ্যেঠুর লাইব্রেরিরুমে গিয়ে হাঁফ ছাড়লুম। এখানে তা-ও বই আছে, সূর্যের আলো আছে। নীচে যাওয়ার কথা ভাবতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমি এবার পুরো লাইব্রেরিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। সব মিলিয়ে এগারোটা র‍্যাক। পেছনের তিনটে সারিতে তিনটে করে, আর সামনের সারিতে দুটো। আমি একদম পেছনের র‍্যাক থেকেই শুরু করলাম। প্রতি র‍্যাকে গাদা-গাদা বই, যদিও খুব যত্ন করে রাখা। লক্ষ করে দেখলাম যে প্রায় প্রতিটা বই-ই ইতিহাস আর সাহিত্যের বিষয়ক, আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে বাংলার ইতিহাসের ওপর।

একেকটা করে বই নামিয়ে দেখতে লাগলাম কোথাও কিছু আছে কি না।

কাজটা সময়সাপেক্ষ তো বটেই, পরিশ্রমেরও। ঘণ্টা-দুয়েক লাগল মোটামুটি সবকটা র‍্যাকের বই নেড়ে-ঘেঁটে দেখতে। ততক্ষণে বইয়ের ধুলোয় আমার অবস্থা কাহিল। কোথাও কিছু পেলাম না। নীচে বাথরুমে গিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে, মুখে-চোখে জল দিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় মনে হল জ্যেঠুর ঘরটা একবার ভালো করে দেখলে হয় না? যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়?

বারান্দাটা পেরোতে যা ভয় লাগছিল সে আর বলার নয়। প্রথম আর দ্বিতীয় ঘর পেরিয়ে জ্যেঠুর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। আর তারপর হাতে রুমালটা জড়িয়ে সন্তর্পণে ঘরের দরজাটা খুললাম।

বুকটা যেন তখন রেলওয়ে ইঞ্জিনের মতো ধক-ধক করছিল। আমি জানি যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে নিয়ে গুরুং যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। তখন ঘরের প্রতি ইঞ্চির ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবে ও। আঙুলের ছাপ না-হয় রুমাল জড়িয়ে ম্যানেজ করা যাবে, মেঝেতে পায়ের ছাপ মুছব কী করে?

ঘরটার চারিদিকে একবার সতর্ক চোখে তাকিয়ে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব গোড়ালি উঁচু করে ভেতরে পা রাখলাম। লক্ষ রাখলাম মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসপত্র যেন মাড়িয়ে না ফেলি।

ঘরটার দরজা দক্ষিণমুখী। কোনার ঘর হওয়ার জন্য উত্তর আর পশ্চিমদিকের দেওয়ালে দুটো জানালা, আর সে-দুটোই সারারাত খোলা থাকার জন্য সারা ঘরে একটা ভারী ঠান্ডা যেন জমাট বেঁধে আছে। সূর্য মাথার ওপর, সারা ঘরে আশ্বিনের নীল আলো খেলা করছে। সেই আলোয় আমি খুব ধীরে-ধীরে ঘরের প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

অন্তত মিনিট দশেক ধরে চারিদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়েও কোথাও কোনও ক্লু বা সূত্র না পেয়ে বেরিয়ে আসতে যাব, আমার অজান্তেই জ্যেঠুর বিছানার দিকে আমার চোখ গেল।



জ্যেঠুর বিছানাটা হচ্ছে পুরোনো জমানার দামি মেহগনি কাঠের বিছানা। হালকা হলদেটে বাদামি রঙ, পালিশ পড়ে চকচক করছে। মাথার দিকে একটা দেড়ফুট উঁচু ব্যাকরেস্ট। চকচকে মেহগনি কাঠের ওপর সূর্যের আলোর একটা হালকা আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় আমার মনে হল কাঠের ওপর এক

কোনায় খুব সম্ভবত পেন্সিলে কিছু একটা লেখা আছে, যাকে ইংরেজিতে বলে স্ক্রিবল করা। কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখলাম ছোট-ছোট অক্ষরে একটা দু'লাইনের ছড়া লেখা,

"মঞ্জুশ্রীর শক্তি পীঠে সোনার তরী গাঁথা/ চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা।"

ছড়াটা সহজ, এক-দু'বার আউড়েই মুখস্থ হয়ে গেল। হাতের লেখাটাও যে জ্যেঠুর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে এই ছড়াটা লেখার মানেটা কী?

এবার আরও একটু ঝুঁকে এলাম, অক্ষরগুলোকে আরও কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখব বলে। এবং তখনই বুঝলাম যে এটা খুব সম্প্রতি লেখা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে যথেষ্ট তাড়াহুড়োর মধ্যে।

এই নিয়ে বেশি ভাবার সময় পেলাম না কারণ ঠিক তখনই বাড়ির সদর দরজা থেকে একটা জোরালো ঠকঠক শব্দ ভেসে এল। অর্থাৎ গুরুং ও তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট বা তাপস, কেউ একজন ফিরে এসেছে।

খুব আস্তে-আস্তে, পা-টিপেটিপে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বুকটা যে ধুকপুক করছিল তাতে সন্দেহ নেই। হাতে জড়ানো রুমালটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ওটা পকেটে রাখলাম। তারপর দ্রুতপায়ে হেঁটে গেলাম সদর দরজার দিকে।

দরজা খুলেই চমক। গুরুং আর তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট তো আছেই, সঙ্গে তাপসও আছে। তার হাতে একটা মস্ত বড় প্যাকেট। ভেতরে ঢুকে জুতো খুলতে-খুলতে তাপস খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলল, "থানাতে একটা কাজে গেসলুম। কাজ-টাজ শেষ হলে দেখি ওনারা এদিকেই আসছেন, তাই আমিও ওঁদের সঙ্গে ঝুলে পড়লুম।"

গুরুং অবশ্য আমার বা তাপসের দিকে বিন্দুমাত্র মন দিল না। গটগট করে জ্যেঠুর বেডরুমের দিকে রওনা দিল। তাপস আমাকে চোখ টিপে আর একটা হাত মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাল যে গুরুংয়ের মাথা এখন খুব গরম। ওর সঙ্গে যেন বিশেষ কথাবার্তা না বলি।

*

ঘণ্টাখানেক বাদে গুরুং অ্যান্ড কোম্পানি জ্যেঠু আর লোবসামের ঘরদুটো সিল করে চলে গেল। যাওয়ার আগে গম্ভীরমুখে বলে গেল অন্তত এক সপ্তাহ যেন আমরা দার্জিলিংয়ের বাইরে না যাই। একটা কেয়ারটেকার কাম কুক ও পাঠিয়ে দিচ্ছে, আপাতত সে-ই আমাদের দেখভাল করবে, যতদিন আমরা এখানে থাকি। বোঝাই গেল যে পুলিশের কাউকে পাঠানো হচ্ছে আমাদের ওপর নজরদারি করার জন্য। গুরুং এ-ও বলে গেল কাল সকাল দশটা নাগাদ ও আবার আসবে, আমাদের জবানবন্দি নিতে।

ওরা যখন চলে গেল তখন বাজে প্রায় সাড়ে তিনটে। আমি বাংলোর ছাদে বসে তাপসের আনা মোমো আর থুকপা খেতে-খেতে প্রশ্ন করলাম, "সারাদিন কী-কী করলি শুনি?"

জ্যেঠুর কাঠের আরামকেদারায় প্রায় আধশোয়া হয়ে একটা গোল্ড ফ্লেক ধরিয়ে বলা শুরু করল তাপস।

"প্রথমে গেলাম ম্যালের ফোন বুথটায়, অনেকগুলো ফোন কল করার ছিল। বেশিরভাগই কলকাতায়, কয়েকটা দিল্লিতে। আমার এক দূরসম্পর্কের মেসোমশাই দিল্লির জেএনইউ-তে ইকোনমিক্সের প্রফেসর, তাঁর সঙ্গেও কিছু কথা হল। বাড়িতে ফোন করাটাই অবশ্য বেশি জরুরি ছিল। জ্যেঠুর উধাও হওয়ার খবরটা আর বাড়িতে বলিনি, বাবা খামোখা টেনশন করবেন। শুধু বলেছি যে আমাদের ফিরতে চার-পাঁচ দিন দেরি হবে, চিন্তা করার কিছু নেই। তোর বাড়িতেও বলে দিয়েছি একই কথা। সে-সব শেষ হলে পর গেলাম অক্সফোর্ড স্টেশনার্সের মালিকের কাছে। উনি একজন হিস্ট্রির প্রফেসরের খবর দিলেন যিনি বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ওপর

একজন অথরিটি, নাম অনিমেষ পাল। বহুদিন বিলেতে পড়িয়েছেন, আপাতত রিটায়ার করে কলকাতায় থিতু। তাঁর সঙ্গেও ফোনে অনেক কথা হল। তারপর গেলাম হিমালয়ান রিট্রিট।”

“সেটা আবার কী?”

“একটা হোটেল। ম্যালের কাছেই।”

“নামটা শোনা শোনা লাগছে কেন বল তো?”

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাপস, “মাসিমা সাধে বলেন তোর মাথার মেমরি সেলগুলো ব্যাটারি সেল হয়ে গেছে? সেদিন দেবাশিস বণিক গাড়ি থেকে নামার সময় বললেন না যে উনি কোথায় উঠেছেন?”

খোঁচাটা বেমালুম হজম করে গেলাম। নামটা মনে রাখা উচিৎ ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেবাশিসদার সঙ্গে দেখা করার দরকার পড়ল কেন?

তাপস আমার মনের প্রশ্নটা আঁচ করেই বলল, “সেদিন কথা বলতে বলতেই বুঝেছিলাম যে ভদ্রলোক এমন কয়েকটা কথা বলেছেন যেগুলো কাঁচা মিথ্যে। মিলিটারি বুটের ব্যাপারটা তো আছেই। তা-ছাড়াও বেশ কিছু কথাবার্তা উনি বলেছেন যেগুলো সত্যি হতে পারে না।”

একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছিলাম, “তা দেবাশিসদার সঙ্গে কী কথা হল?”

“বলব বন্ধু, সময় এলে সব বলব। এত অধৈর্য হলে চলে? তারপর সেখান থেকে গেলাম থানায়। সেখানে দেখি গুরুং আমাদের দত্তসাহেবকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে। দত্তসাহেব প্রাক্তন আমলা না হলে, আর প্রফেসর যাদব তাঁর প্রভাব না খাটালে, ভদ্রলোক বোধহয় আজকের রাতটা লক আপেই কাটাতেন।”

“আর দত্তবাবুর সেই ড্রাইভার?”

“বীরেন্দ্র থাপা? তাকে আর হাজতবাস থেকে বাঁচানো যায়নি। অবশ্য তার কারণও আছে। শ্রীথাপার বক্তব্য বড়ই গোলমেলে। সে এখন বলছে যে লোবসাম তার ভাইপো নয়, তার ছোট না মেজ শালি কোনও এক তিব্বতিকে বিয়ে করেছিল, লোবসাম তাদের ছেলে। সে-মহিলা মারা যাওয়াতে বীরেন্দ্রর বউ নাকি মা-মরা বোনপোকে কাছে এনে রেখেছিল। ছোকরা বসে-বসে ঘরের অন্ন ধ্বংস করছে দেখে বীরেন্দ্রই দত্তসাহেবের সঙ্গে কথা বলে এই বাড়িতে বহাল করায়। আর মিথ্যা কথা বলার কারণ হচ্ছে ছোকরার নাকি র‍্যাশন কার্ড-টার্ড কিছু নেই, মানে আইনত ও এ-দেশের নাগরিকই নয়, তাই শ্যালিকাপুত্রকে ভাইপো বানানো। তবে বলা বাহুল্য, গুরুং তার কথার একটি বর্ণও বিশ্বাস করেনি, জবানবন্দি শোনামাত্র পুলিশ কাস্টডিতে নিয়েছে। কথাবার্তায় যা বুঝলাম আজ রাতে থাপাবাবু গুরুং-এর থাবার নীচেই থাকবেন। সে যাকগে, তুই তোর দিকের খবর বল।”

সব খবর ডিটেইলসে বললাম। কিছুই যে পাইনি, সে-কথাও। প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনছিল তাপস। শেষে ওই কাঠের ব্যাকরেস্টে লিখে রাখা দু’লাইনের কবিতাটা বললাম। শোনামাত্র ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে বসল তাপস, “কী বললি? কাঠের ওপর পেন্সিলে লেখা ছড়া? আবার বল দেখি।”

আবার আওড়ালাম ছড়াটা, “মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠে সোনার তরী গাঁথা/ চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা।”

“ওটা জ্যেঠুর হাতের লেখা? তুই শিওর?” তাপস উঠে বসল, স্পষ্টতই উত্তেজিত সে।

“সেন্ট পার্সেন্ট। এই তো লাইব্রেরির একগাদা বইয়ের মার্জিনে জ্যেঠু নিজের হাতে নোট লিখে রেখেছেন। ও হাতের লেখা জ্যেঠু ছাড়া আর কারও হতেই পারে না। আমি একদম শিওর।”

তাপস আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মাথাটা ধীরে-ধীরে পেছনে এলিয়ে দিল। চোখ দুটো বোজা, ভুরুদুটো প্রচণ্ড কুঁচকে আছে। ডান হাতটা মুঠো করে কপালের ওপর রাখা।

তাপসের এই অবস্থা আমি খুব ভাল করে চিনি। এর মানে ও মগজ তোলপাড় করে কিছু একটা ভাবছে। এখন কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই খ্যাঁক করে উঠবে। তবুও ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁ রে, এতে কী ওই অষ্টমহাসিদ্ধ না কারা, তাদের খোঁজ লিখে গেছেন জ্যেঠু?"

"না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর ভেসে এলো।

"তুই শিওর?"

"সেন্ট পার্সেন্ট।"

"কী করে এত শিওর হচ্ছিস তুই?" চ্যালেঞ্জ করলাম তাপসকে।

উঠে বসল তাপস, তারপর আমার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "তার কারণ, আজকে আমি প্রফেসর পালের সঙ্গে এ-নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। উনি জোর দিয়ে বলেছেন যে অষ্টমহাসিদ্ধ একটা হুজুগ মাত্র। অনেক খোঁজখবরের পরেও তারা যে কোনওকালে ছিল সে-ব্যাপারে কংক্রিট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, খুব সম্ভবত ব্যাপারটা পুরোটাই ভাঁওতা। জ্যেঠুকে যারা হুমকি চিঠিটা পাঠিয়েছে, তারা পাতি ক্রিমিনাল, ওদের সঙ্গে সিদ্ধ, ভাজা, পোড়া -কোনও দলেরই কোনও সম্পর্ক নেই।"

খবরটা শুনে বুকে একটা জোর ধাক্কা খেলাম। এই যে গোপন সংগঠন না কী-সব শুনলাম দু'দিন ধরে, সে-সব কিচ্ছু নেই? তাহলে তাশি দোরজিকে খুন করল কে? জ্যেঠুকে তুলে নিয়ে গেল কারা?

আপনমনে বলতে লাগল তাপস, "পুঁথিটা খুব সম্ভবত এই বাংলোর মধ্যেই কোথাও আছে, বুঝলি। এবং তার সন্ধান করার সূত্রটাই এই ছড়াটায় সাংকেতিক ভাষায় লিখে রেখেছেন জ্যেঠু। ভেবেছেন যে, বাই চান্স যদি ওঁর কিছু হয়ে যায়, তাহলে এই ছড়ার সূত্র ধরে কেউ যেন পুঁথিটা খোঁজার একটা উদ্যোগ নিতে পারে।"

"কিন্তু তার জন্যে খাটের ব্যাকরেস্ট কেন? লেখার জায়গার কি অভাব ছিল? বিশেষ করে যখন অতবড় লাইব্রেরি পড়ে আছে?"

একটু সময় নিয়ে উত্তরটা দিল তাপস, "আমার মনে হয় জ্যেঠুকে আমরা যতটা সরল ভেবেছি ততটা সরল উনি নন। তাশি দোরজি খুন হওয়াতে উনি বুঝে যান যে শত্রুপক্ষ জেনে গেছে পুঁথিটা আজ-কালের মধ্যেই পাচার হয়ে যাবে। একটা অ্যাটাক যে আসতে চলেছে সেটা উনি আন্দাজ করেছিলেন বটে, শুধু এটা বুঝতে পারেননি যে সেটা এত তাড়াতাড়ি আসবে। ফলে কাল রাতে যখন অপরাধীদের চলাফেরা টের পেলেন, তখন তাড়াহুড়োয় নাইট ল্যাম্প বা টর্চের আলোতে এমন একটা জায়গায় ক্লু-টা লিখে রাখলেন যেটা রাতের বেলায় কারও চোখে পড়বে না, অথচ জায়গাটা এমন হওয়া চাই যেখানে দিনের বেলায় লোকের আনাগোনা হবে। তাদের কারও-কারও চোখে হয়তো পড়বে। কিন্তু সবাই বুঝবে না। বুঝবে তারাই যাদের বোঝা দরকার।"

"কিন্তু তাপস, তুই আমাকে একটা কথা বল, যদি ওই অষ্টমহাসিদ্ধ বলে কিছু না-ই থাকে, তাহলে জ্যেঠুকে চিঠিটা পাঠাল কারা? তাশি দোরজিকে খুন করল কারা? জ্যেঠুকে কিডন্যাপই বা করল কারা?"

"আমার মনে হচ্ছে যে এর পেছনে একটা বড় দল আছে রে সুবোধ। এবং তারা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত। নইলে এইরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্রাইম করা চাট্টিখানি কথা নয়, সে তাশি দোরজির খুনই হোক বা জ্যেঠুর কিডন্যাপিং। এরা স্মাগলার হতে পারে, যারা দেশের ঐতিহাসিক জিনিস বিদেশে পাচার করে মোটা টাকা কামায়। অথবা শখের কালেক্টর হতে পারে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহ বাড়ানোই যাদের উদ্দেশ্য, তার জন্য দু-চারটে খুনখারাপি করতেও যারা পিছপা হয় না। অথবা ধর..."

"কিউরিও শপের মালিক?"

সরু চোখে আমার দিকে তাকাল তাপস, "হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে যদি সে-রকম মোটা দাঁও মারার সুযোগ থাকে। এবং শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে এমন শিক্ষিত অথচ ধুরন্ধর লোক আছে, যারা চর্যাপদের ভাষায় চিঠিও লিখতে পারে।"

একটা কথা দুপুর থেকেই মাথায় ঘুরছিল, সেটা জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, দত্তবাবুও তো চর্যাপদের ভাষায় চিঠি লিখতে পারেন, পারেন না?"

"না পারার কী আছে। যাঁরা এই ভাষা নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই পারেন। চেষ্টা করলে প্রফেসর যাদবও পারবেন হয়তো। বাংলাটা যে উনি পড়তে পারেন সে তো জানাই, নইলে আর জ্যেঠুর কাছ থেকে পুঁথিটার কপি চাইবেন কেন? মোটমাট তারা যে-ই হোক, খুব সুবিধের যে নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে।"

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, এ তো কেউই সন্দেহের বাইরে নন দেখছি। "হ্যাঁ রে, ওরা জ্যেঠুকে মেরে ফেলবে না তো?" প্রশ্ন করলাম আমি। নারানজ্যেঠু আমার কেউ নন, তাপসের কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তবুও সকাল থেকে জ্যেঠুর জন্য আমার খুবই উদ্বিগ্ন লাগছিল, আর সেই সঙ্গে তাপসের ঠান্ডা ব্যবহার দেখে একটা অস্বস্তি।

"নাহ রে সুবোধ, সে-ঝামেলা ওরা নেবে না। ওদের চাই পুঁথিটা, সেটা পেলেই ওদের কাজ হাসিল। পুঁথিটা সেটা যাতে দার্জিলিংয়ের বাইরে না যায় সেটা এনশিওর করার জন্যেই জ্যেঠুকে তুলে নিয়ে যাওয়া। খুন-জখম করা ওদের কাজ নয়, বিশেষ করে ভিক্টিম যদি হন নরনারায়ণ ভট্টাচার্য-র মতো এলাকায় পরিচিতি আছে এমন লোক, তাশি দোরজি-র মতো দাগি ক্রিমিনাল নয়। তাঁকে খুন করলে যে হাঙ্গামা হবে তাতে ওদের অসুবিধাই বেশি। ফলে এখন আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে পুঁথিটা খুঁজে বের করা। ওটাই জ্যেঠুর প্রাণভোমরা। ওটা আমাদের হাতে এলেই জ্যেঠুকে উদ্ধার করাটা সহজ হয়ে যাবে।"

"সে কী? পুঁথিটা উদ্ধার করাটাই এখন তোর কাছে প্রায়রিটি? জ্যেঠুকে উদ্ধার করা নয়?" অবাক ভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাপস, তারপর বলল, "না সুবোধ। যারা জ্যেঠুকে কিডন্যাপ করেছে তারা অতি বুদ্ধিমান, অতি ধুরন্ধর লোক। আমার মনে হয় পুলিশ পুরো দার্জিলিং খুঁড়ে ফেললেও জ্যেঠুকে অত সহজে উদ্ধার করতে পারবে না। "

"কেন? পারবে না কেন? পুলিশ পারে না এমন কাজ হতে পারে নাকি? তুই-ই তো বলেছিলি, পুলিশ চাইলে পাতাল থেকেও অপরাধীকে ধরে আনতে পারে?"

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল তাপস, তারপর বলল, "ছোটবেলায় কখনও কানামাছি খেলেছিস সুবোধ? কানামাছির হাত থেকে লুকিয়ে থাকার সবচেয়ে বেস্ট উপায় কী বল তো? কানামাছির পেছনে-পেছনে লুকিয়ে থাকা। কারণ নিজের পিঠের দিকটা সে কখনও দেখতে পায় না।"

তাপসের কথাবার্তা শুনে আমার এবার বিরক্ত লাগছিল, একটু কড়া গলায় বললাম, "এ-সব হেঁয়ালি করা বন্ধ করবি? এখন জ্যেঠুকে উদ্ধার করার উপায় কী সেইটে বল।"

তাপস লাইব্রেরির জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এখন আমাদের হাতে একটাই মাত্র উপায় আছে সুবোধ, টোপ ফেলে ওদের এই বাড়িতে আবার ডেকে আনা, পুঁথিটার খোঁজে। আর তখনই ওরা তিননম্বর ভুলটা করবে। ওটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি।"

"তিন নম্বর ভুল মানে?" আমার কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল কথাটা শুনে, "তুই কী করে জানলি ওরা এর আগে দুটো ভুল করেছে? মানে ওরা কে সেটাই যখন জানা যাচ্ছে না..."

তাপস হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "তার কারণ ওরা যে কারা সেটা পুরোটা না জানলেও দার্জিলিংয়ে ওদের হয়ে কোন মহাপুরুষ এই কাজে নেমেছেন সেটা আমি জানি সুবোধ। আমি জানি

কে তাশি দোরজিকে খুন করিয়েছে, আমি এ-ও জানি যে কে বা কোন মহাত্মারা কাল জ্যেঠুর ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন।”

শোনামাত্র আমি লাফিয়ে উঠলাম, “মানে? তুই জানিস কে এ-সব বদমাইশি করছে? আর তুই সেটা পুলিশকে বলছিস না?”

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল তাপস, “না দোস্ত, এখন নয়। কারণ আদালতে ওদের অপরাধ প্রতিষ্ঠা করার মতো প্রমাণ আমার হাতে এখনও আসেনি, তাই ওদের ধরলেও ছেড়ে দিতেই হবে। আর এখন তাড়াহুড়ো করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া মানে জ্যেঠুর জীবন বিপন্ন করা। এখন আমাদের উচিত টোপটা খুঁজে বের করা, যেটার হিন্ট জ্যেঠু অলরেডি দিয়ে গেছেন।”

তাপসের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি খুব ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। এখন ও মাথা খাটাবে ওই চারটে লাইন নিয়ে। আমি অ্যাকশনের লোক, মগজমারির কাজ আমার নয়।

দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে এল। পাহাড়ি অঞ্চলে অন্ধকারটা হঠাৎ করে নেমে আসে। আমি ঘর থেকে বের হয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল এই নিস্তব্ধ জনহীন পাহাড়ি অন্ধকার যেন আমাকে গিলে খেতে আসছে। আমার গা-টা হঠাৎ করেই শিরশির করে উঠল।

লাইব্রেরিতে ফিরে দেখি লাইট জ্বালিয়ে আরামকেদারায় ভূতের মতো বসে আছে তাপস। সামনে মেঝেতে একগাদা বইপত্র ছড়ানো। আমাকে দেখেই প্রথম প্রশ্ন করল ও, “শক্তিপীঠ বলতে তুই কী বুঝিস সুবোধ?”

অবাকই হলাম প্রথমে, “একান্নটা শক্তিপীঠের গল্প জানিস না? আরে সেই যে সতীর দেহত্যাগের গল্প রে। শিবের বারণ সত্ত্বেও শিবহীন যজ্ঞে গেলেন সতী। তারপর বাবার মুখে পতিনিন্দা শুনে মারা গেলেন। তারপর শিবের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করা, তাণ্ডব নৃত্য, সেই দেখে বিষ্ণুর তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ একান্ন টুকরোয় কেটে ফেলা, আর সেই একান্নটা টুকরো নিয়ে একান্নটা শক্তিপীঠ। এ-সব গল্প শুনিসনি?”

উদ্ভ্রান্ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল তাপস, “গল্পটা জানি রে সুবোধ। কিন্তু এই একান্নটা শক্তিপীঠের মধ্যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও মঞ্জুশ্রীর নামে কোনও শক্তিপীঠ বা কোনও উপপীঠের খোঁজ পাচ্ছি না কেন বল দেখি?”

প্রশ্নটা শুনে থমকে গেলাম। আজ অবধি শুনে এসেছি যে একান্নটা শক্তিপীঠ আছে আর কালীঘাট তার মধ্যে একটা, এটুকু জানার পর বাকি শক্তিপীঠগুলো কোথায়-কোথায় সে-সব জানার চেষ্টাই করিনি আজ অবধি।

“তুই ঠিক জানিস যে মঞ্জুশ্রীর নামে কোনও শক্তিপীঠ নেই?” প্রশ্ন করলাম আমি। তাপস কোনও জবাব দিল না। শুধু সামনে ফেলে রাখা বইয়ের স্তূপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

কিছুক্ষণ দু’জনের চুপচাপ কাটল। তারপর খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই বিড়বিড় করল তাপস, “মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠ, মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠ... আচ্ছা... এই মঞ্জুশ্রী ভদ্রমহিলা কে?”

বিরক্ত হলাম, “ভদ্রমহিলা আবার কী-রকম ভাষা? উনি নিশ্চয়ই কোনও দেবী যাঁর নামে শক্তিপীঠ একটা আছে, আমরা হয়তো জানি না।”

“বলিস কী রে! ছোটবেলা থেকে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এ-সব পড়ছি, ফি বচ্ছর দুর্গাপুজো কালীপুজো এ-সব করছি, কিন্তু আজ অবধি এই মঞ্জুশ্রী দেবীর নাম শুনিনি কেন বল তো?”

“কারণ... কারণ...” উত্তরটা মনের মধ্যে হাতড়াবার চেষ্টা করলেও কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

“জ্যেঠুর লাইব্রেরিতে অভিধানগুলো কোথায় আছে জানিস?”

না জানার কিছু নেই। ঘণ্টা-কয়েক আগেই প্রায় পুরো লাইব্রেরিটা নিজের হাতে ঘেঁটেছি। ফলে একটা মোটকা অভিধান তাপসের সামনে এনে রাখতে আমার মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগল না। তাপস

দেখলাম ম-এর পাতাটা খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তবে সেটা বেশিক্ষণের জন্য না। মিনিট-দুয়েক পরেই মাথা তুলে বলল, “হ্যাঁ রে, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার বলে একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ছিলেন না?”

“হ্যাঁ তো। কেন?”

“তোর মেজো মাসির সেই কানাডায় থাকা কোন এক বান্ধবীর নাম মঞ্জুশ্রী নয়?”

তাপসের মেমরি যে সাঙ্ঘাতিক ভালো স্বীকার করতেই হবে। “হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। কিন্তু এ-সব জিজ্ঞেস করছিসই বা কেন?”

এবার সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্তস্বরে একটা বোমা ফেলল তাপস, “তার মানে মঞ্জুশ্রী হচ্ছে গিয়ে মেয়েদের নাম, তাই না? কিন্ত এখানে বলছে যে মঞ্জুশ্রী আসলে বৌদ্ধদের কোনও এক দেবতার নাম?”

কথাটা পরিষ্কার হল না আমার কাছে, “বুঝলাম না। দেবদেবীর নামে তো লোকজনের নাম রাখা হয়েই থাকে। এতে এত অসুবিধার কী হল?”

তাপস প্রায় ধমকে উঠল, “অসুবিধা মানে? কথাটা মাথায় ঢুকল তোর? মঞ্জুশ্রী কোনও দেবী নয়, দেবতার নাম! এবার বুঝলি কিছু?”

এবার ব্যাপারটা বুঝলাম, আর আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। গীতশ্রী, অনুশ্রী, ভাগ্যশ্রী, দেবশ্রী, মঞ্জুশ্রী এ সবই তো মেয়েদের নাম বলে জেনে এসেছি। আজ হঠাৎ করে মঞ্জুশ্রী পুরুষ দেবতা হয় কী করে?

ততক্ষণে তাপস ঝটাপট কয়েকটা বৌদ্ধধর্মের মূর্তিটুর্তির ওপর বই নামিয়ে ফেলেছে। প্রায় ঝড়ের বেগে সেগুলোর পাতা উল্টে যাচ্ছিল। আমি চুপচাপ ওকে দেখে যাচ্ছিলাম। এইসব বইপত্তর নাড়াঘাঁটার দায়িত্ব ওর। আমার দায়িত্ব শুধু অ্যাকশনের।

মিনিট দশেক বাদে শেষ বইটার পাতা বন্ধ করে ফের আরামকেদারায় মাথা এলিয়ে বসল তাপস। তারপর স্বগোতক্তির ঢংয়ে বলল, “মঞ্জুশ্রী যদি কোনও দেবতার নামই হবে সুবোধ, তাহলে শক্তিপীঠের কথা আসে কোথা থেকে বল দেখি? মানে শক্তিপীঠ তো দেবীদের হয়, দেবতাদের নয়, তাই না? ফলে মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠ কথাটার কোনও মানেই হয় না, কী বলিস?”

আমার বলার কিছু ছিল না। শুধু বুঝতে পারছিলাম, দৈবাৎ যে ক্লু’টা বের করলাম, তার আর কোনও তাৎপর্যই রইল না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি!

“অথচ... অথচ...” হাঁটাহাঁটি করতে-করতে কী যেন একটা ভাবছিল তাপস, “জ্যেঠু যদি সত্যিই ইম্পর্ট্যান্ট কিছু একটা লিখে রেখে যান, তাহলে সেটা ভুল হওয়ার কথা নয়?”

আমি জবাব দিলাম না। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ করে তাপস আমার সামনে এসে দাঁড়াল, “ছড়াটা বল তো একবার।”

এবার বেশ থেমে-থেমে, স্পষ্ট উচ্চারণে বললাম ছড়াটা, “ মঞ্জুশ্রীর শক্তি পীঠে সোনার তরী গাঁথা/ চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা।”

তাপস ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধদুটো শক্তহাতে ঝাঁকাল একবার, “ভালো করে ভেবে বল সুবোধ, কোনটা ঠিক। মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠে, নাকি মঞ্জুশ্রীর শক্তি পীঠে?”

অবাক হওয়ার আর বাকি ছিল না। বললাম, “বুঝলাম না। দুটোই তো একই।”

“না, এক নয়। শক্তি আর পীঠের মধ্যে গ্যাপ ছিল কি ছিল না?”

চোখ বন্ধ করে লেখাটা মনে করার চেষ্টা করলাম। জ্যেঠুর বেডরুম... ব্যাকরেস্ট... তাতে সূর্যের আলো এসে পড়ছে...আলোটা অল্প দুলছে...বাইরে পাখির ডাক...আমি পা-টিপেটিপে এগিয়ে যাচ্ছি... নিচু হলাম...পেন্সিল দিয়ে লেখা... মঞ্জুশ্রীর শক্তি.....

"ছিল। গ্যাপ ছিল।" চোখ খুলে বললাম আমি। শক্তি আর পীঠ একসঙ্গে নয়, আলাদা করে লেখা ছিল।"

লাফিয়ে উঠল তাপস। তারপর চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলল, "মার দিয়া কেল্লা সুবোধ, মার দিয়া কেল্লা।"

তাকিয়ে দেখি ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, "ওটা মঞ্জুশ্রীর শক্তিপীঠ নয়, মঞ্জুশ্রীর শক্তির পীঠ। শক্তি, মানে যাকে ইংরেজিতে বলে কনসর্ট। যেমন শিবের পার্বতী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, তেমনই বৌদ্ধ দেবতাদেরও শক্তি আছেন। এই মঞ্জুশ্রী একজন বোধিসত্ত্ব গোত্রের দেবতা। আর তাঁর শক্তি কে বল তো?"

"কে?"

"সরস্বতী।"

"তার মানে..."

"তার মানে খুব লুজলি ট্রানস্লেট করলে ওটা হবে 'সরস্বতীর পীঠে সোনার তরী গাঁথা/ চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা।' এখন কথা হচ্ছে যে এখানে পীঠ বলতে নিশ্চয়ই পীঠস্থান বলা হচ্ছে, তাই না?"

"অবশ্যই! এখানে পীঠ যেখানে সাধন ভজন পুজো পাঠ এইসব হয় সেইরকম জায়গা, যেমন আদ্যাপীঠ।" আমার বুকের রক্ত দ্রুত চলাচল করছিল।

"তাহলে সরস্বতীর পীঠ বা সাধনপীঠ বলতে যেখানে সরস্বতীর সাধন ভজন পুজোপাঠ হচ্ছে এমন জায়গা বোঝায়, তাই নয় কী?"

"তা বোঝায়। তবে চট করে পীঠ বা সাধনপীঠ শব্দটা শুনলে রেগুলার পুজো বা তন্ত্রসাধনা হয় এমন জায়গার কথাই মাথায় আসে আগে। যেমন ধর সাধক বামাক্ষ্যাপার পঞ্চমুণ্ডীর সাধনপীঠ। বা ধর..."

"তাহলে সরস্বতীপীঠ বলতে কী বুঝব? যেখানে রেগুলার সরস্বতীর পুজো হয়?"

"দেখ ভাই, বাংলায় রেগুলার পুজো হয় এমন দেবীর মধ্যে কালী বা দুর্গার নামই সবার আগে মনে আসে। রেগুলার পুজো হয় এমন কোনও সরস্বতী মন্দিরের কথা তো জানি না।"

"সরস্বতীর পুজো কারা করে?"

"স্কুল কলেজের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা করে। হাজার হোক বিদ্যের দেবী তো!" বলতে-বলতেই মাথায় কী-যেন একটা ক্লিক করে গেল, "সারা বাড়ি খুঁজে তো জ্যেঠুর তো পুজো-আচ্চা করার কোনও প্রমাণ পেলাম না। তাহলে কি এখানে পুজো অর্থে বিদ্যাচর্চা ধরতে হবে?"

"অবশ্যই..." অস্থির দেখাচ্ছিল তাপসকে, "দ্যটস কোয়াইট অবভিয়াস নাউ। সে-ক্ষেত্রে জ্যেঠুর বিদ্যাচর্চার আসন কোথায় হতে পারে?"

"এই লাইব্রেরিতে, আর কোথায়?"

দ্রুত সারা ঘরের মধ্যে প্রায় দৌড়ে বেড়াতে লাগল তাপস, রুদ্ধশ্বাসে বলতে লাগল, "এখানেই আছে সুবোধ, জ্যেঠু তাঁর সাধনার ধন এখানেই লুকিয়ে রেখেছেন। ইশ, এত বড় ব্যাপারটা মিস করে গেলাম কী করে রে সুবোধ। এই ঘরে কখনও তালা দেওয়া থাকে না, ফলে কেউ সন্দেহই করতে পারবে না যে অত বড় সম্পদ জ্যেঠু এখানেই লুকিয়ে রেখেছেন। ব্রিলিয়ান্ট, লোকটা সিম্পলি ব্রিলিয়ান্ট।"

"কিন্তু এখানেই যদি থাকে তো কোথায় আছে? আজ আমি সবক'টা বই নিজের হাতে নামিয়ে দেখেছি তাপস, কোথাও কোনও পুঁথির চিহ্নমাত্র নেই।"

"মাথা খাটা সুবোধ, মাথা খাটা। সরস্বতীর পীঠে, মানে যেখানে বসে জ্যেঠু সরস্বতীর আরাধনা করতেন, অর্থাৎ কি না যেখানে বসে পড়াশোনা করতেন, সেটাই বোঝাচ্ছে না কি? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সেটা কোন

জায়গা?”

বলামাত্র দু’জনের চোখই একইসঙ্গে এক জায়গাতেই গেল।

জ্যেঠুর আরামকেদারা!

খুব আস্তে-আস্তে এসে সেখানে বসল তাপস। তারপর প্রায় মন্ত্র পড়ার মতো করে আওড়াল, “চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা। আমরা সন্ধানী, সোনার নৌকো বা দাঁড় যাই হোক, পেতে চাইছি। কিন্তু পেতে গেলে মাথা ছোঁয়াতে হবে কেন? কার কাছে ছোঁয়াতে হবে? কোথায় ছোঁয়াতে হবে? কী-ভাবে ছোঁয়াতে হবে?”

“কী-ভাবে ছোঁয়াতে হবে মানে যে-ভাবে ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করার সময় মাথা ছোঁয়ায় লোকে, সে-ভাবেই ছোঁয়াতে হবে।”

“একদম আক্ষরিক অর্থটাই নিতে হবে বলছিস?” একটা ঘোর-লাগা চোখে আমার দিকে তাকাল তাপস, তারপর বলল, “বেশ, তাই নিলাম।”

এরপরই ও একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল। আরামাকেদারা থেকে নেমে সটান প্রণাম করার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

প্রায় পাঁচ-ছ’সেকেন্ড ও-ভাবে থেকে মাথাটা আস্তে আস্তে তুলতে লাগল তাপস, আর ঠিক খানিকটা তুলেই স্থির হয়ে গেল। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম কারণটা কী।

ওর চোখের ঠিক সামনে এখন আরামকেদারার সামনে রাখা ফুটরেস্ট বা পা-দানিটা!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পা-দানিটা নিজের কোলে নিল তাপস। তারপর উলটে ফেলল ওটা। এবারে খেয়াল করলাম যে পা-দানির পাটাতনটা একটু বেশি মোটা, প্রায় ছ’ইঞ্চি। চারিদিকে বর্ডারে সুন্দর কাঠের কাজ করা, ঝালরের মতো। এই বর্ডারটার জন্যই বোঝা যায় না যে পাটাতনটা কতটা পুরু।

আমার বুকটা ডিজেল ইঞ্জিনের মতো ধক-ধক করছিল। দেখলাম যে এই শীতেও তাপসের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, ওর হাত-পা কাঁপছে।

পা-দানিটা দু’হাতে তুলে একটু নাড়াল তাপস।

ভেতর থেকে ভারী কিছু একটা নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে এল। ঠক-ঠক!

অল্প আলোর মধ্যেই দু’জনে দু’জনের দিকে তাকালাম। তাপসের দৃষ্টিতে উত্তেজনার সঙ্গেও যেটা মিশেছিল সেটা হচ্ছে বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতে যাওয়ার আনন্দ।

আগেই বলেছি ধাঁধা বা জিগ-স পাজল সলভ করায় তাপসের একটা আশ্চর্য প্রতিভা ছিল। ফলে খুপরিটার দরজাটা যে চারিদিকের বর্ডারের একটা সাইডে, সেটা আবিষ্কার করতে ওর সময় লাগল ঠিক পাঁচ মিনিট।

সেই মুহূর্তটা আমার বহুদিন মনে থাকবে। মনে হচ্ছিল যেন বহুদিন ধরে লুকিয়ে রাখা অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজা হয়ে যাব। শরীরের সমস্ত রক্ত আমাদের মুখে এসে জমা হয়েছে।

খুব সন্তর্পণে পা-দানিটা সামান্য কাত করল তাপস।

প্রথমে বেরিয়ে এল একটা ডায়েরি। চামড়ায় বাঁধানো। সেটা বের করে পাশে রাখল ও। তারপর আরেকটু কাত করল।

এইবার লাল শালু দিয়ে মোড়া একটা লম্বাটে জিনিস বেরিয়ে এল। খুব ধীরে-ধীরে, অনেক যত্নে লাল শালুটা খুলল তাপস।

একটা পুঁথি। ওপরে আর নীচে কাঠের মলাট। মাঝখানে হলুদ, বিবর্ণ তালপাতার সারি। মাথার দিকে দু’জায়গায় সোনার সুতো দিয়ে বাঁধা। ওপরের কাঠে আবছা হয়ে এসেছে পুঁথির নাম, লিপিটা আজকালকার

বাংলা লিপি বলে বোঝা না গেলেও নামটা পড়তে কষ্ট হল না।

আবার হৃৎপিণ্ডটা যেন রেলের ইঞ্জিনের মতো দৌড়োচ্ছিল। কাঁপা-কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলাম, "এটা কী তাপস?"

তাপস ডান হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল। তারপর চোখ মটকে বলল, "সুবনকেড়ুয়াল।"

খুব যত্নে পুঁথিটা আবার যেখানে ছিল সেখানে ঢুকিয়ে রাখল তাপস। ডায়েরিটা আমাকে দিয়ে বলল, "এ জ্যেঠুর লেখা ডায়েরি না হয়ে যায় না। আর এ-জিনিস পুঁথির সঙ্গে রাখা আছে মানে জ্যেঠু নিশ্চয়ই ভাইটাল কিছু লিখে রেখেছেন এখানে। তুই এক কাজ কর, এখানে বসে-বসে ডায়েরিটা পুরোটা পড়। আমি ঘণ্টা-দুয়েক বাদে ফিরে আসছি। আর হ্যাঁ, আমরা বোধহয় কাহিনির শেষে এসে পৌঁছেছি। কাল সকালেই এসপার বা ওসপার হয়ে যাবে।"

"এ কী?" অবাক হলাম আমি, "এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস?"

বেরিয়ে যাওয়ার আগে সেই চিরচেনা বাঁকা হাসিটা আমাকে উপহার দিয়ে গেল তাপস, "ফাঁদ পাততে।"

তাপস বেরিয়ে যেতে আমি জ্যেঠুর ডায়েরিটা নিয়ে মগ্ন হলাম।

*

পরের দিন সকাল প্রায় দশটা। আগের দিন তাপসের ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছিল। রাতের খাবার খেতে-খেতে আমরা ছকে ফেলেছিলাম আজকের পরিকল্পনা।

সেই মতো তৈরি হয়ে বসে আছি। ডাইনিং-এর চেয়ারগুলো নিয়ে লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে। আরামকেদারা আর ফুটরেস্টটা রাখা হয়েছে জানালার সামনে।

ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক দশটার সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ। দরজা খুলে দেখি গুরুং আর দু'জন কনস্টেবল। তাদের মধ্যে একজন আবার সেই সবসময় চোখে চশমা পরে থাকা পুলিশ জীপের ড্রাইভারটি। ততক্ষণে ওপরে লাইব্রেরিতে সবার বসার ব্যবস্থা করে নিচে নেমে এসেছে তাপস। কনস্টেবল দু'জন বাইরেই রইল, গুরুংকে ওপরে নিয়ে গেল তাপস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় আবার ঠকঠক। আমিই গিয়ে দরজাটা খুললাম। দত্তসাহেব আর প্রফেসর যাদব। এঁদের অবশ্য আমিই নিয়ে গেলাম লাইব্রেরি রুমে।

এরা দু'জনে এসে বসতে লাইব্রেরির মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। গুরুংয়ের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করছে না সে। প্রফেসর যাদবও দেখলাম অদ্ভুত একটা তেতো মুখ করে বসে আছেন। তার মানে দু'জনের মধ্যে কালকে ভালোই কথা কাটাকাটি হয়েছে।

তবে সেরা চমকটা ছিল এর পরেই। তৃতীয়বারের জন্য সদর দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হতে নীচে নেমে দরজা খুলে দেখি দেবাশিসদা!

দেবাশিসদার মুখে সেই চিরপরিচিত স্মাইল। ভদ্রলোক আমার পিঠ চাপড়ে সহাস্যে বললেন, "কী ভায়া, তোমরা নাকি এখানে কী-সব গোল্ড মাইনের সন্ধান-টন্ধান পেয়েছ, অ্যাঁ? কাল রাতে তোমার ওই তাপস আমাকে যা বলল সে-সব শুনে তো আমি তো এক্কেবারে স্পেলবাউন্ড হে! সে যা বলেছে তার যদি আদ্ধেকটাও সত্যি হয় তাহলে তো কোটি টাকার মামলা, অ্যাঁ?"

শুনে প্রমাদ গণলাম। তার মানে জ্যেঠুর উধাও হওয়ার ব্যাপারে এঁকে কিছুই বলেনি তাপস। আর গোল্ড মাইনের ব্যাপারটাই বা কী? নাকি এটাও তাপসের পাতা একটা ফাঁদ, পুঁথিটার লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে লোকটাকে?

তাপস চা বানিয়ে রেখেছিল। নিজের ফ্লাস্ক থেকে গরম চা কাপে ঢেলে সবার হাতে একটা করে কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলা শুরু করল ও।

"জেন্টলমেন, বুঝতেই পারছেন যে আজকে আপনাদের এখানে ডেকে আনার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। গত তিনদিনে এই বাংলোয় এমন দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যাতে আমি ও আমার বন্ধু হঠাৎ করেই জড়িয়ে পড়েছি। আপনারা প্রায় সবাই জানেন ঘটনাদুটো কী, তবুও পুরো ব্যাপারটা আরও একবার খোলসা করে বলা দরকার।

'আপনারা সবাই জানেন যে আমার জ্যেঠু, অর্থাৎ প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক নরনারায়ণ ভট্টাচার্যের হাতে কোনওভাবে একটা অতি দুর্লভ পুঁথি এসে পড়ে, যেটা নাকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমূল্য আবিষ্কার। পুঁথিটা জ্যেঠুর হাতে কী করে আসে সেটা আমরা এখনও জানি না। শুধু এটা জানি যে পুঁথিটা পাওয়ার পরেই জ্যেঠুর পেছনে কেউ বা কারা উঠেপড়ে লাগে। জ্যেঠু তাতে খুব একটা বিচলিত হননি, যতদিন না তাঁর কাছে একটি হুমকি চিঠিও পাঠানো হয়। চিঠিটা পাওয়ার পর জ্যেঠু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কারণ উনি চেয়েছিলেন পুঁথিটা যেন কলকাতায় যোগ্য জায়গায় পৌঁছোয়। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে ডেকে আনা হয়।

'আমরা আসার পরদিনই ম্যালের কাছে একটি লজে তাশি দোরজি বলে একজন খুন হন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, খুন হওয়ার কয়েক-ঘণ্টা আগে এঁকে জ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। জ্যেঠু পরে স্বীকার করেন যে এঁকে জ্যেঠু চিনতেন, চিনতেন কোনও একটি প্রাচীন গুপ্তসংগঠনের সদস্য হিসেবে। বলা বাহুল্য সেই গোপন পুঁথি আর এই গুপ্তসংগঠনের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জ্যেঠু ডিটেইলসে বলার সময় পাননি। তার আগেই কাল রাতে কেউ বা কারা এসে পুঁথিটার খোঁজে জ্যেঠুর বেডরুমে হানা দেয়, এবং না পেয়ে জ্যেঠুকে কিডন্যাপ করে। তারই সঙ্গে উধাও হয় জ্যেঠুর কাজের লোক লোবসাম।"

সবাই নেড়েচেড়ে বসলেন। সবার নজর এখন তাপসের দিকে।

"এখানে বলে রাখা ভালো যে জ্যেঠু আমাদের এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব এমনি-এমনি দেননি। আমি আর সুবোধ মিলে এর আগেও কিছু ছোট-খাটো অভিযান করেছি। তাই আমাদের যখন এত ভরসা করে জ্যেঠু ডেকে এনেছিলেন, তখন তাঁকে বিপদের মুখে একলা ফেলে আমরা চলে যেতে পারি না।"

"তাহলে কি পুলিশের পাশাপাশি আপনারাও গোয়েন্দাগিরি করবেন?" প্রশ্ন করল গুরুং। স্বরে সন্দিহান হওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

"না মিস্টার গুরুং। আমরা গোয়েন্দা নই। আমরা শুধুমাত্র কতগুলো ঘটনা বা তথ্য বিচার করে কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসি, আর সেগুলো পুলিশকে জানিয়ে দিই। পুলিশের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। শুধুমাত্র তদন্তে সাহায্য করা ছাড়া আমাদের আর কোনও ভূমিকা নেই।"

উত্তরটা মনে হয় গুরুংকে সন্তুষ্ট করল। একটু সহজ হয়ে বসল সে। তাপস বলতে শুরু করল।

"আমরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েছি যে পুঁথির জন্য এত হাঙ্গামা সেটা এখনও অপরাধীদের হাতে পৌঁছয়নি। পৌঁছলে জ্যেঠুকে কিডন্যাপ করার দরকার হতো না। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুঁথিটার জন্য অপরাধীরা এই বাংলোয় ফের হানা দেবে।"

"প্রশ্নই ওঠে না।" গুরুং-এর স্বর শোনা গেল, "কাল বিকেল থেকেই দু'জন কনস্টেবল এই বাড়ির ওপর নজর রাখছে। ওদের সাহস হবে না এই চৌহদ্দিতে ঢোকার। সে মাস্টারসা'ব-এর যত কাছের লোকই হোক না কেন।"

ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট। দত্তসাহেব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল তাপস, "আচ্ছা দত্তবাবু, আপনি কোনওদিন জ্যেঠুর মুখে এই ছড়াটা শুনেছেন, 'মঞ্জুশ্রীর শক্তি পীঠে

সোনার তরী গাঁথা/ চাইলে পেতে, হে সন্ধানী, ক্ষণেক ছোঁয়াও মাথা।"

দত্তসাহেব চোখ বুজে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "নাহ। মনে পড়ছে না। কেন?"

নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল তাপস, তারপর বলল, "তার কারণ কিডন্যাপড হওয়ার আগে জ্যেঠু এই ছড়ার আড়ালে একটি সূত্র কোনওভাবে আমাদের কাছে দিয়ে যেতে সমর্থ হন। এবং সেই সূত্র ধরে কাল সন্ধেবেলা সারা বাড়ি খুঁজে পুঁথিটা আমরা উদ্ধারও করেছি।"

ঘরের মধ্যে বোম পড়লেও বোধহয় এত চমকাত না লোকে। দত্তসাহেব তো লাফিয়ে উঠলেন, "মানে? ইয়ার্কি হচ্ছে? তোমরা মশকরা করছ আমার সঙ্গে? মশকরা?" তাকিয়ে দেখলাম গুরুং আর প্রফেসর যাদবের চোখেও অবিশ্বাসের ছায়া।

কঠিনস্বরে ধীরে-ধীরে বলল তাপস, "না দত্তবাবু, আমি আপনাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না। পুঁথিটা আমরা সত্যিই খুঁজে পেয়েছি এবং এ-ও বলছি যে সেটা এই মুহূর্তে এই ঘরেই আছে। মুশকিল হচ্ছে যে জ্যেঠুকে খুঁজে পাওয়ার সূত্র না মেলা অবধি সেটা আমি আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না।"

সারা ঘরে সূচ পড়লেও শোনা যায় এমন নিস্তব্ধতা।

"এখানে বলে রাখা ভালো, পুঁথির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জ্যেঠুর হাতে লেখা একটি ডায়েরিও পাই। তাতে এই রহস্যের অন্য অনেক অজানা দিক জ্যেঠু লিখে রেখে গেছেন। এবার সেগুলো আপনাদের না জানালে বাকি কথাগুলো নিয়ে এগোনোই যাবে না।

'জ্যেঠু তাঁর মা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে যান। পরলোকতত্ব বা প্রেততত্ব নিয়ে তাঁর মনে আগ্রহ জন্মায়। এই নিয়ে খোঁজ করতে-করতে তিনি এমন এক প্রাচীন বৌদ্ধতান্ত্রিক দলের কথা জানতে পারেন যাঁরা নাকি মৃতদের আত্মাকে জাগ্রত করার পদ্ধতি জানতেন, এবং তার জন্য তাঁরা চক্রসম্বর নামে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করদর্শন দেবতাকে পুজো দিতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে এঁরা কোনও মূর্তিপুজো করতেন না। এই চক্রসম্বরের পুজোপদ্ধতি লেখা ছিলো যে পুঁথিতে, সেটাকেই তাঁরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন এবং খুব যত্ন করে রক্ষা করতেন। আরও একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, এই বৌদ্ধদের গুপ্ত দলটির মধ্যে নাকি এমন আটজন স্পেশ্যালি ট্রেইনড কম্যান্ডোগোছের লোক ছিলেন যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল পুঁথিটাকে রক্ষা করা। এঁদের বলা হতো অষ্টমহাসিদ্ধ।"

এতটা একদমে বলে থামল তাপস। সবার নজর এখন ওর দিকে।

"এই নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে-করতে জ্যেঠু ওই লাইব্রেরিতেই একজন পণ্ডিত মানুষের সংস্পর্শে আসেন। তিনিও বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে অনেকদিন ধরে গবেষণা করছিলেন। দু'জনের আলাপ ঘনিয়ে আসতে ভদ্রলোক একদিন জ্যেঠুকে জানান যে এই চক্রসম্বরের পুঁথি এবং অষ্টমহাসিদ্ধদের গল্পটা যে অকাট্য সত্যি তার প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। বলা বাহুল্য জ্যেঠু তাঁর কথাটা বিশ্বাস করেননি, তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। তখন ভদ্রলোক এই বিষয়ে জ্যেঠুর আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে একদিন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। আর সেদিনই জ্যেঠু জানতে পারেন যে তাঁর পণ্ডিত বন্ধুটিও আসলে সেই অষ্টমহাসিদ্ধদের মধ্যে একজন, এবং শুধু একজন নন, তাদের প্রধান পুরোহিতও বটে!"

সারা ঘরে আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। আড়চোখে একবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলাম। নড়াচড়া তো দূরস্থান, কারও চোখের পলক অবধি পড়ছে না।

"সেখানেই জ্যেঠুকে অষ্টমহাসিদ্ধদের দলের বাকিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। এ-সবের ব্যাপারে অনেক কথাই লেখা আছে ডায়েরিতে। এই অষ্টমহাসিদ্ধদের অনেক গুপ্ত আচার, পদ্ধতি, সাংগঠনিক কার্যকলাপ আর সংকেতের বিবরণ জ্যেঠু দিয়েছেন। এখানে সে-সবের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে

এ-সবের মধ্যে একটা সংকেত বা চিহ্ন আপনারা অনেকেই গত দু'দিনে একবার না একবার দেখেছেন, সেটা হচ্ছে অষ্টমহাসিদ্ধদের এমব্লেম বা কোট অফ আর্মস। দেখতে ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মতো, মাথার দিকের শুঁড়দুটো একটু বাঁকানো আর মধ্যিখানে একটা স্টার সাইন আঁকা, ওটার নাম বজ্রচিহ্ন। এই বজ্রচিহ্ন আমরা গত তিনদিনে দু'বার দেখেছি। কোথায়-কোথায় দেখেছেন সেটা মনে করতে পারছেন দত্তবাবু?"

"হ্যাঁ।" চাপা গলায় বললেন দত্তবাবু, "যে হুমকি চিঠিটা নারানকে পাঠানো হয়েছিল তার চার কোনায় এই চিহ্নটা আঁকা ছিল।"

"কারেক্ট। সেই জন্যই চিঠিটাকে ফাঁকা হুমকি বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি জ্যেঠু। আমাদের ডেকে পাঠান। আর দ্বিতীয়বার এই চিহ্নটা দেখি তাশি দোরজি'র মৃতদেহের পাশে, তাশির রক্ত দিয়ে আঁকা। অতএব যে বা যারা এই পুঁথির ওপর নজর দিয়েছে, তাশি দোরজির হত্যার পেছনে যে তাদের হাতই আছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওরা নিশ্চয়ই জানতো যে তাশি-র ডেডবডি শনাক্ত করতে জ্যেঠুকে ডেকে আনা হবে। তাই ওই চিহ্নটা এঁকে রাখা, জ্যেঠুকে ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য।" এতটা বলে একবার থামল তাপস। তারপর বলল, "এইখানে আমি মিস্টার গুরুংকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।"

গুরুং সপ্রশ্ন চোখে চাইল।

"তাশি খুন হওয়ার পরে আপনি ওর বডি দেখার আগেই জেনে যান যে সেদিন দুপুরে ম্যালে ওর সঙ্গে জ্যেঠুর কথা হয়। কারেক্ট?"

"হ্যাঁ, আমাকে আমার ইনফর্মাররা সেরকমই খবর দিয়েছিল।"

"মানে আপনার ইনফর্মাররা আগে থেকেই তাশির ওপর নজর রাখছিল, ঠিক কি না?"

"হুম।"

"কারণটা জানতে পারি?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মুখ খুলল গুরুং, "আজ থেকে দু-সপ্তাহ আগে বেঙ্গল পুলিশের কাছে সিবিআই থেকে একটা নোটিস আসে। তাতে বলা হয় যে এমন একজন কুখ্যাত আর্ট স্মাগলার দার্জিলিংয়ে ঢুকেছে বা ঢুকতে চলেছে যার নাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক সামগ্রী চুরি করায় জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর নামে ইতিমধ্যেই ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে রেড কর্নার নোটিশ জারি করা আছে। আমাদের বলা হয়েছিল সতর্ক থাকতে, এমনকি দিল্লি থেকে নাকি একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার দার্জিলিং আসছেন এই সূত্রে। এদিকে আমাদের ইন্টারনাল সোর্স থেকে খবর পাই যে তাশি দোরজি নামের একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোক ভুটান থেকে চোরাপথে নর্থ বেঙ্গলে ঢুকেছে। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে আমাদের দেরি হয়নি। তাই ওকে চোখে-চোখে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও যে কে ওকে খুন করে গেল সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"তা এই তাশি দোরজিই যে সেই ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার সে নিয়ে কোনও অকাট্য প্রমাণ ছিল আপনাদের হাতে?"

"না, তা ছিল না। ইন ফ্যাক্ট কে যে এই মহাপুরুষ, তাঁর নাম ধাম ঠিকানা কী, সে-সব কিছুই আমাদের জানানো হয়নি। ইনি এতই ধূর্ত আর ধড়িবাজ যে সিবিআই-এর কাছে এঁর কোনও ছবি বা অন্য কোনও ইনফর্মেশনই নেই।"

"হুম। কিন্তু তাশি খুন হওয়ার পরেই জ্যেঠু কিডন্যাপড হন, রাইট? তার মানে তাশি যে-সে লোক নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। অথচ এই গল্পে তাশি-র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ জ্যেঠুর ডায়েরি বলছে যে এই তাশি দোরজি হল গিয়ে অষ্টমহাসিদ্ধদের মধ্যে একজন।"

আবার বোমা বিস্ফোরণ। এবার দেখলাম এমন কি গুরুংয়ের মুখটাও হাঁ হয়ে গেছে।

“জ্যেঠু যখন এদের দলের মধ্যে আসেন, তখন অষ্টমহাসিদ্ধর মধ্যে চারজনের বেশি কেউ নেই। গুপ্ত সংগঠন ভেঙে চুরমার। একমাত্র যে জিনিসটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই পুঁথিটা। ওই পুঁথিটা তখনও তারা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি যত্নে রক্ষা করেন।

‘জ্যেঠু অনেক চেষ্টায় আর পরিশ্রমে এই দলে ঢোকেন এবং সেই পণ্ডিত মানুষটির স্নেহধন্য হওয়ার সুবাদে দলের প্রায় সেকেন্ড ইন কমান্ড হয়ে ওঠেন। তখনও কিন্তু তিনি পুঁথিটি দেখার বা হাতে নেওয়ার সুযোগ পাননি।

‘সে-সুযোগ আসে এক চক্রসাধনার দিন। জ্যেঠুর ডায়েরি অনুযায়ী, বছরে দু’টি পূর্ণিমার দিনে এই চক্রসাধনার আসর বসতো এবং সেইদিনেই পুঁথিটি অষ্টমহাসিদ্ধরা দেখার বা হাতে নেওয়ার সুযোগ পেতেন। জ্যেঠুকে সেই বিশেষ দিনে প্রথমবারের জন্য পুঁথিটি দেখার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং তিনি পুঁথিটি হাতে নিয়ে বুঝতে পারেন যে কী ঐশ্বর্য তাঁর হাতে এসে পড়েছে। তখন তিনি সেই পণ্ডিত বন্ধুটি, যাঁকে তিনি এবিডি বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁকে প্রস্তাব দেন পুঁথিটিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের স্বার্থে জনসমক্ষে আনার।”

এতটা বলে হঠাৎ করে একটা উদ্ভট প্রশ্ন করে বসল তাপস, “আচ্ছা দত্তবাবু, তিনদিন হল আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আপনার নামটা জানা হল না। কাইন্ডলি আপনার পুরো নামটা একবার জানাবেন প্লিজ?”

“কেন বলো তো?” ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করেন দত্তবাবু, “এর সঙ্গে তোমাদের এই গোয়েন্দাগিরির কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?”

“থাকলেও থাকতে পারে, তাই না? কারণ জ্যেঠু বলছেন যেখানে উনি অষ্টমহাসিদ্ধদের দলে যোগ দেন, সেটা ওই এবিডি-র পৈতৃক বাসস্থান। আর সেটা হচ্ছে কুচবিহার রাজবাড়ি। আপনিও তো ওই ফ্যামিলিরই লোক, তাই না?”

“তাতে কী প্রমাণ হয়?” হঠাৎ করেই তেরিয়া হয়ে উঠলেন দত্তবাবু, “তোমার বক্তব্যটা কী হে ছোকরা, কুচবিহার রাজবাড়িতে ঘটা সমস্ত ঘটনার দায়ভার কি আমার?”

“না দত্তবাবু, আমি তো সেই দাবি করিনি। শুধু আপনার পুরো নাম জানতে চেয়েছি। সেটা জানাতে আপনার এত আপত্তি কেন?”

“তা আপনি হঠাৎ করে ওঁর পুরো নাম জানতে চাইছেনই বা কেন, সেটা জানতে পারি কি?” শান্ত ও ইস্পাতকঠিন স্বরে কথাটা বললেন প্রফেসর যাদব।

“কারণ যে পণ্ডিত মানুষটি জ্যেঠুকে এই অষ্টমহাসিদ্ধ’র দলে নিয়ে আসেন, তিনিও কুচবিহার রাজবাড়ির সন্তান। তাঁর নাম হচ্ছে অব্যয়বজ্র দত্ত, এ বি ডি। আমি খোঁজখবর করে জেনেছি যে উনি আপনার নিজের বড় দাদা। আর আপনার নাম হচ্ছে...”

“অদ্বয়বজ্র দত্ত।” শান্ত স্বরে বললেন দত্তবাবু।

সঙ্গে-সঙ্গে গুরুংয়ের হাত চলে গেল কোমরে রাখা হোলস্টারে। সেদিকে তাকিয়ে হাত তুলে গুরুংকে শান্ত হতে ইশারা করল তাপস।

“শুধু তাই নয় দত্তবাবু, নারানজ্যেঠু-র সঙ্গে আলাপ জমানোর পেছনে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা এবার একটু খুলে বলবেন প্লিজ?”

খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাপসের দিকে চেয়ে রইলেন দত্তবাবু। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেক কষ্ট করে ভেতরে থাকা আবেগটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। তাঁর মুখটা রাগে, ঘৃণায় আর কষ্টে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। তবে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরেই চেয়ারের হাতলে একটা ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে

উঠলেন তিনি, "এই নরনারায়ণ ভট্টাচার্য, দ্যাট স্কাম অন আর্থ, আমার দাদার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পুঁথিটা আমাদের রাজবাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে পালায়। আমি সেই সময়টা দিল্লিতে ছিলাম, তাই কিছু করতে পারিনি। এই শয়তানটা তারপর উধাও হয়ে যায়, উইদাউট এনি ট্রেস। ওর জন্য আমার দাদা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, আমাদের দল ছত্রখান হয়ে যায়। আমি গত সাতটা বছর ধরে পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছি লোকটাকে..."

"আর তারপর এখানে এসে তিনমাস আগে নারানজ্যেঠুর খোঁজ পান, রাইট?" ধারালো প্রশ্ন ছুটে এল তাপসের দিক থেকে, "তারপরেই এখানে বাসা নেওয়া, জ্যেঠুর সঙ্গে আলাপ জমানো, লোবসামকে কাজে ঢোকানো, এ-সবই শুরু হয়, ঠিক কি না?"

জ্বলন্ত চোখে তাপসের দিকে তাকিয়ে ফুঁসছিলেন দত্তবাবু। অসহ্য রাগে তাঁর ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। তারপরেই নিজের মুখখানা দু'হাতে ঢেকে মাথা নিচু করে ফেললেন তিনি।

সেদিকে আমল দিল না তাপস। শুধু গম্ভীরমুখে বলল, "আমি এ-ব্যাপারে প্রায় পুরোটাই অনুমান করতে পেরেছি দত্তবাবু। এবং আমি এ-ও জানি যে তাশির খুনটা আপনি করেননি, আর জ্যেঠুকে কিডন্যাপ করার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ শেষ অবধি আপনি একজন সিভিলিয়ান, ক্রিমিনাল নন। আপনি শুধু চেয়েছিলেন লোবসামকে দিয়ে জ্যেঠুর ওপর গোয়েন্দাগিরি করাবেন, যাতে পুঁথিটা উদ্ধার করা যায়, তাই তো? চিঠিটাও যে আপনারই কীর্তি সেটা বুঝতেও বেশি মাথা লাগাতে হয় না। কারণ আর যাই হোক, বাংলা ভাষার ইতিহাসের ওপর আপনার ইন্টারেস্টটা খাঁটি। আপনি যে চর্যাপদের ভাষায় চিঠি লিখতে ভালোই পারেন সেটা আপনার ওই দুই পিরিয়ডের মধ্যবর্তী ভাষায় পদ রচনা করতে পারা দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু যেটা আপনি বুঝতে পারেননি সেটা হচ্ছে যে আপনার এনগেজ করা এজেন্ট শ্রীমান লোবসাম কবেই তলে-তলে ভিড়ে গেছে কুমিরের সঙ্গে।"

"কুমির?" বিস্ময় ফুটে উঠল দত্তবাবুর স্বরে, "এখানে কুমিরের কথা এল কী-করে?"

"যে কুমিরটাকে আপনি খাল কেটে ঘরে এনেছেন দত্তবাবু।" ধারালো গলায় বলল তাপস, "তাশি-র খুন থেকে শুরু করে জ্যেঠুর কিডন্যাপ অবধি সবই যাঁর অসামান্য প্রতিভার সামান্য নিদর্শন।"

"কিন্তু তাহলে লোবসাম আছে কোথায় এখন?" বিভ্রান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন দত্তবাবু।

"সেটা বলা খুব মুশকিল দত্তবাবু। খুব সম্ভবত গত রাতে বাংলোতে আততায়ীদের ঢোকার ব্যবস্থা সে-ই করে দেয়, এবং সেটাই ছিল তার লাস্ট ডিউটি। আমার ধারণা হচ্ছে এর পরেই তাকে গোপনে কোথাও একটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাকে আর তার নতুন মালিক বাঁচিয়ে রাখা সমীচীন মনে করেননি। হয়তো তার দেহটা পড়ে আছে এই দার্জিলিংয়েরই কোনও খাদের নীচে।"

"আর ইউ শিওর অ্যাবাউট ইট?" প্রশ্ন করল গুরুং।

"না, আমি শিওর নই, এ আমার যুক্তিনির্ভর অনুমান। তবে এটুকু বলতে পারি এ-সব ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আমার কোনও অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়নি মিস্টার গুরুং।"

"আর পুঁথিটা... ওটা কোথায় আছে?" শক্ত গলায় কথাগুলো বলে সোজা হয়ে বসলেন দত্তবাবু ওরফে শ্রীঅদ্বয়বজ্র দত্ত, "ওটা আমার চাই... ওটা দত্ত ফ্যামিলির এয়ারলুম।"

তাপসের ঠোঁটের কোণে ফের সেই বাঁকা হাসিটা ফিরে এল, "ওটা এখন দেশের সম্পদ দত্তবাবু, আপনার ফ্যামিলি এয়ারলুম নয়। তবে সত্যি কথাটা স্বীকার করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।" বলে এবার প্রফেসর যাদবের দিকে ফিরল তাপস, "আপনি জে এন ইউতে কোন বিভাগে পড়ান প্রফেসর যাদব?"

"হিস্ট্রি। মিডেইভাল পিরিয়ড ইন ইন্ডিয়ান হিসট্রি।" দেখলাম যে কথাটা বলতে-বলতে প্রফেসর যাদবের চোয়ালটা অল্প শক্ত হয়ে উঠল।

"সত্যিই কি তাই?"

"কেন বলো তো?" প্রশ্ন করলেন দত্তবাবু, "এতে আবার সন্দেহ করার কী পেলে?"

"কারণ আমার চেনা এক ভদ্রলোক জেএনইউ-তে পড়ান, ইকোনমিক্স। তিনি ইউনিভার্সিটিতে তন্নতন্ন করে খবর নিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে যোগেন্দ্র যাদব নামে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কেউ পড়ান না, ব্যাদার গোটা ইউনিভার্সিটিতেই ওই নামে কোনও প্রফেসর নেই।"

কথাটা শুনে প্রত্যেকের মাথা ঘুরে গেল প্রফেসর যাদবের দিকে। তবে মানতেই হবে যে ভদ্রলোকের নার্ভটা স্টিলের তৈরি, তিনি পালটা চ্যালেঞ্জ করে বসলেন, "আপনি কী বলতে চাইছেন মিস্টার তাপস, আমি মিথ্যে কথা বলেছি আপনাদের?"

প্রফেসর যাদবের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়ল তাপস। তারপর বলল, "আপনি ঠিক মিথ্যেবাদী নন। এই ব্যাপারে আরও অনেক তথ্য যোগাড় করেছি আমি। আমার ডেটা সোর্স বলছে যে আজ থেকে প্রায় বছর আটেক আগে যজুবেন্দ্র যাদব নামে একজন তরুণ শিক্ষক জেএনইউ-র হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেন। ভদ্রলোকের জন্ম-কর্ম-পড়াশোনা সবই কলকাতায়, রেজাল্টও ব্রিলিয়ান্ট। পড়ানোর গুণে তিনি খুব দ্রুত ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষকদের আস্থাভাজন ও প্রিয় হয়ে ওঠেন। পুরোনো পুঁথি আইডেন্টিফাই বা সার্টিফাই করার ব্যাপারে আশ্চর্য প্রতিভা ছিল ভদ্রলোকের, গোটা দেশে এই সার্কিটে ওঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সেই বাবদে ভদ্রলোককে দেশের বিভিন্ন মিউজিয়াম ঘুরে বেড়াতে হত।

'এর মধ্যে হঠাতই কলকাতার ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে গুপ্তযুগের একটা রেয়ার স্বর্ণমুদ্রা চুরি যায়। ব্যাপারটা পেপারেও বেরিয়েছিল, জানি না আপনাদের মনে আছে কি না। অনেক তদন্তের পর পুলিশ বের করে যে এর পেছনে একটি র‍্যাকেট আছে এবং তার মাথা হিসেবে চিহ্নিত করে জেএনইউ-র সেই তরুণ অধ্যাপককে। ভদ্রলোকের জেল হওয়া অবধারিত ছিল, কিন্তু পুলিশের কাস্টডি থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যান সেই প্রতিভাবান ইতিহাসবিদ। তারপর থেকে আজ অবধি তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমার চেনা সেই ভদ্রলোক এ-ও বলেছেন যে এই যজুবেন্দ্র যাদব প্রায় বারোটা দেশি-বিদেশি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন, অন্যের গলার স্বর হুবহু নকল করতে পারতেন, আর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কোনও এক নাটকে নাকি একেবারে নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিমিনাল বলতে হবে।"

প্রফেসর যাদবের চোখে এতদিন ধরে ঝুলে থাকা উদাস, প্রফেসরসুলভ দৃষ্টিটা বদলে যাচ্ছিল রাগে আর তাচ্ছিল্যে। ঠোঁটটা সামান্য বাঁকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "আপনার কথা বুঝতে পারছি না তাপসবাবু। আপনি কী ইন্ডিকেট করতে চাইছেন? আমিই সেই গড নো'জ হু যজুবেন্দ্র যাদব? এইসব খুনজখম আর কিডন্যাপিং-এর পেছনে আমার হাত আছে?"

"যদি তা নাই বা হবে যোগেন্দ্রবাবু, প্রফেসর শব্দটা আর ব্যবহার করলাম না..." বলে সামনের দিকে প্রায় ঝুঁকে এল তাপস, "একটা কথার জবাব দিন তো, কাল যখন আমরা থানা থেকে মিস্টার গুরুংকে নিয়ে আসছি, তখন আপনারা দু'জন এই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনারা জিজ্ঞেস করলেন বাড়িতে লোক নেই কেন, কী হয়েছে। আমি জবাব যে দিলাম জ্যেঠুকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার উত্তরটা কী ছিল মনে আছে?"

প্রফেসর যাদব উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিষধর কেউটে সাপ ফণা মেলার ঠিক আগের মুহূর্তে ফুঁসছে।

সেদিকে দৃকপাত করল না তাপস। অল্প হেসে বলল, "আপনি বললেন, 'অ্যাঁ? সে কী? নারায়ণবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে? কারা? কেন? কী-করে?' এবার বলুন তো যোগেন্দ্র ওরফে যজুবেন্দ্র যাদব, আমি তো

একবারও বলিনি যে জ্যেঠু কিডন্যাপড হয়েছেন। সকাল থেকে খুঁজে না পাওয়ার তো আরও অনেক মানে হয়, তাই না? ধরে নিয়ে যাওয়ার কথাটাই বা আপনার মাথায় এল কেন?”

স্প্রিং লাগানো পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন যোগেন্দ্র, ওরফে যজুবেন্দ্র যাদব। তাঁকে আটকাল গুরুং। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি একজন রেসপেক্টেড প্রফেসরের বিরুদ্ধে যে-সব গাঁজাখুরি অভিযোগ আনছেন, সে-সব প্রমাণ করতে পারবেন তো?”

দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখে তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তাপস। আস্তে-আস্তে ক্ল্যাপস দিতে দিতে বলল, “বাহ বাহ, শাবাস। এই না কালকেই আপনাদের মধ্যে থানায় চুলোচুলি থেকে শুরু করে হাতাহাতি হতে যাচ্ছিল? আর এখন তো এক রেসপেক্টেড প্রফেসরের প্রতি আপনার ভালোবাসা তো একেবারে টইটম্বুর দেখছি মিস্টার গুরুং! তা আপনাদের মধ্যে কবে থেকে এ-রকম ভাব-ভালোবাসা চলছে শুনি? অন্তত মাস তিনেক তো হবেই, তাই না?”

গুরুংকে দেখে মনে হল পারলে এখনই হোলস্টারে রাখা রিভলবারটা বের করে তাপসকে গুলি করে দেয় আর কি! অতি কষ্টে রাগ প্রশমিত করে দাঁতে দাঁত ঘষে সে, “কবে থেকে ভাব-ভালোবাসা মানে? ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন একটু খুলে বলবেন তাপসবাবু? আমি তিন মাস ধরে ওঁকে চিনি?”

“চেনেন না? সত্যিই?” অবাক হওয়ার ভান করল তাপস। তারপর ধারালো স্বরে বলল, “তবে পুরো গল্পটাও না-হয় আমিই বলি? আপনারা না-হয় মাঝখানে ভুল হলে শুধরে দেবেন, কেমন?

‘আমাদের দত্তবাবু অনেক খুঁজে-খুঁজে মাস তিনেক আগে দৈবাৎ নারানজ্যেঠুর খোঁজ পান। নারানজ্যেঠু আগে এঁকে চিনতেন না, কোনওকালে দেখেনওনি। তবে ইনি কিন্তু নারানজ্যেঠুকে চিনলেন, কী করে সেটা জানার বিষয় বটে। আমার ধারণা অব্যয়বজ্র দত্ত আত্মহত্যা করার আগে নারানজ্যেঠুর নাম ঠিকানা, ফটো, মায় ঠিকুজি-কুষ্ঠী সবই জানিয়ে দিয়ে গেছিলেন নিজের ভাইকে। সেই সূত্র ধরেই দত্তবাবু অনেক ঘুরে-ফিরে খবর-টবর নিয়ে এই লেবংয়ে এসে আমাদের নারানজ্যেঠুকে স্পট করলেন।

‘এর আগে কিন্তু দত্তবাবু একজন শখের ইতিহাসবিদ হিসেবে মোটামুটি নাম কিনেছেন। এইভাবেই কোনও একটা সূত্রে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয় প্রফেসর যাদবের। যজুবেন্দ্র তখন বোধহয় যোগেন্দ্র অবতারে বিরাজ করছিলেন। প্রতিভাবান ক্রিমিনালদের একটা বড় গুণ হচ্ছে খুব সহজে লোকের আস্থা অর্জন করে নেন। আমাদের দত্তবাবুও সেই ফাঁদে পড়লেন। একই সাবজেক্টের পণ্ডিত লোক পেয়ে বোধহয় খেয়াল করেননি কতটা বলা উচিত আর কতটা বলা উচিত নয়। একদিন কোনও বিষয় আলোচনা চলতে-চলতে যজুবেন্দ্র ওরফে যোগেন্দ্রকে হড়হড় করে সব বলে দিলেন, মায় তাঁর ফ্যামিলি এয়ারলুমের কথাটি।

‘এই চক্রসম্বরের পুঁথি-র কথা শোনামাত্র যজুবেন্দ্র বুঝতে পারে যে কতবড় একটা দাঁও এখন তার হাতের কাছে। ততদিনে সে ইন্টারন্যাশনাল আর্ট স্মাগলার হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে, তার নামে ইন্টারপোলের হুলিয়া বেরিয়েছে। তার উচিত ছিল কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা। কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে নিয়তি কেন বাধ্যতে! সে চট করে তার পুরোনো নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভেট করে। পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যেও নিশ্চয়ই তার চর আছে। নইলে এতদিন ধরে সে গ্রেফতারি এড়িয়ে থাকছে কী করে? সেইভাবেই সে এমন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাকে কেউ সন্দেহ করবে না। এবং সেই মানুষটি হচ্ছেন আপনি, মিস্টার গুরুং।”

“এ-সবের কোনও প্রমাণ আছে গোয়েন্দামশাই?” গুরুংয়ের শক্ত চোয়ালে যে বাঁকা হাসিটা ঝুলছে তার কতটা যে রাগ আর কতটা তাচ্ছিল্য বোঝা মুশকিল।

“আছে বই কি! নইলে আর সামনে দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা বলছি কী করে? তা এতটাই যখন শুনলেন, কষ্ট করে না হয় বাকিটাও শুনে নিন, কোথাও ভুল হলে আপনারা দুই পার্টনার ইন ক্রাইম মিলে একটু শুধরে দেবেন কিন্তু, ওকে?

‘প্ল্যানটা দু’জনে মিলে যত্নেই সাজিয়েছিলেন কিন্তু। প্রথমে লোবসামকে হাত করা হয়, খুব সম্ভবত অবৈধ ভাবে এ-দেশে বসবাস করার অভিযোগে তাকে জেলে পাঠানো হবে, এই ভয় দেখিয়ে। সে-বেচারা ডাবল এজেন্ট হয়ে গেল, একই তথ্য দু’জায়গায় সরবরাহ করতে লাগল, দত্তবাবুকে আর আপনাকে।

‘এদিকে দত্তবাবু অনেক চেষ্টা করেও পুঁথিটার কোনও খোঁজ না পেয়ে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। ওই হুমকি চিঠিটা তারই ফলশ্রুতি। চিঠিটা পাওয়ার পর জ্যেঠু পুঁথিটার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন। এদিকে ততদিনে পুঁথিটা নিয়ে তাঁর অ্যাকাডেমিক কাজ শেষ। ওটা তাঁর হাতে রেখে আর লাভ নেই। তাই তিনি আমাদের ডেকে আনেন ওটাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। খবরটা লোবসাম যথারীতি আপনাদের পৌঁছে দেয়। আপনারাও বুঝতে পারেন যে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আগত। পুঁথিটা এবার তার গোপন লুকোনোর জায়গা থেকে সামান্য হলেও প্রকাশ্যে আসবে। অন্ততপক্ষে এই বাংলোতে তো বটেই, নইলে পরেরদিন জ্যেঠু ওটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন কী করে? তাই সেই রাতেই পুঁথিটা সরাবার প্ল্যান হয়। লোবসামই বোধহয় খবর দেয় যে পুঁথিটা জ্যেঠুর শোওয়ার ঘরেই আছে।

‘কিন্তু সেই মুহূর্তে সিনে এন্ট্রি নেয় আরেকজন যার আগমন আপনাদের পুরো প্ল্যান চৌপাট করে দেওয়ার উপক্রম করে। তাশিও বোধহয় দত্তবাবুর মতই নারানজ্যেঠুকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সে-ও দার্জিলিংয়ে আসে পুঁথিটা নারানজ্যেঠুর কাছ থেকে উদ্ধার করতেই। আমার ধারণা সেদিন ম্যালে সেই নিয়েই কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল দু’জনের মধ্যে।

‘যে-মুহূর্তে তাশি-র সঙ্গে জ্যেঠুর দেখা হওয়ার কথা গুরুংয়ের ইনফর্মাররা গুরুংকে জানায়, সেই মুহূর্তে গুরুং এই তাশির সমস্ত ডিটেইলস যোগেন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। যোগেন্দ্র বোঝেন যে পুঁথিটার আরেকজন দাবিদার এসে উপস্থিত। তাশি দোরজি যে অষ্টমহাসিদ্ধদের মধ্যে একজন, সে-খবরটা নিশ্চয়ই দত্তবাবুই জানিয়েছিলেন যোগেন্দ্রকে। এদিকে সব প্ল্যান নিখুঁতভাবে ছকে ফেলা হয়েছে, পিছিয়ে আসার উপায় নেই। ফলে তাশিকে মরতে হল। কী ইনসপেক্টর সাহেব, ঠিক বলছি তো?”

“তাপসবাবু, ভুলে যাবেন না যে আপনি একজন সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনছেন। যদি প্রমাণ না করতে পারেন, আপনাকে কিন্তু এর ফল ভুগতে হবে।” গুরুং এর স্বরে হুমকির সুরটা স্পষ্ট।

“মিস্টার গুরুং, আপনি যে সরকারি অফিসার, তার ওপর অতি বুদ্ধিমান মানুষ -সে আমরা জানি। মুশকিল হচ্ছে গত কয়েকদিনে আমাদের সামনে অন্তত দু’বার এমন কিছু বেফাঁস বলেছেন বা করেছেন যা আপনার মুখোশ খুলতে আমাদের খুবই সাহায্য করেছে। শুনবেন নাকি সেগুলো?”

কোনওদিকে ঘাড় নাড়াবার ইচ্ছে বা সময় কিছুই ছিল না আমার। তবুও মনে হল আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এলাকার মধ্যে যেন কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হল। কারও বসার ভঙ্গিমায় একটু অতিরিক্ত সতর্কতা, শ্বাসপ্রশ্বাস একটু ধীর হয়ে আসা... আর তারই সঙ্গে... কোথাও থেকে চাপা এবং সতর্ক বুটের আওয়াজ ভেসে এল কি?

“খেয়াল করে দেখুন মিস্টার গুরুং, যোগেন্দ্র ওরফে যজুবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় গত পরশু, এই বাড়িতে। আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় প্রফেসর যাদব বলে। ওঁর নাম যে যোগেন্দ্র, সেটা আমরা জানতে পারি যখন ওঁরা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন, তার অনেক আগেই আপনি বেরিয়ে গেছেন। অথচ গতকাল যখন জ্যেঠুর ঘর সিল করার পর আপনি যখন দত্তবাবুকে থানায় হাজিরা দিতে বললেন, তখন আপনি ওঁকে কী বলে সম্বোধন করলেন? যোগেন্দ্রজি বলে, তাই না? আপনি কি কাইন্ডলি জানাবেন, কী করে এক রাতের মধ্যে আপনি ওঁর ফার্স্ট নেম জেনে ফেললেন?”

সমস্ত ঘরে বজ্রগর্ভ পরিস্থিতি। দত্তবাবু স্থাণু হয়ে বসে আছেন, যোগেন্দ্র ওরফে যজুবেন্দ্র-র মুখে শীতল ক্রোধ, আর হিংসার ছায়া। আড়চোখে দেখলাম যে ভদ্রলোকের ডান হাতটা ক্রমশ গুটিয়ে ওঁর কোমরের দিকে আসছে। গুরুং খর চোখে চেয়ে আছে তাপসের দিকে, তার চোখে যে দৃষ্টি, সেটাকে খুনে দৃষ্টি বললে কম বলা হয়।

তবে শুধু এই নয়। আমার ইন্দ্রিয়ের র‍্যাডারে আরও কয়েকটা ইঙ্গিত ধরা পড়ল। যেমন মনে হল বেশ কিছু পায়ের শব্দ ঘিরে ধরেছে এই ঘরটাকে, আকাশে এতক্ষণ ভেসে থাকা আধখানা চাঁদের আলো যেন হঠাৎ করেই কিছুটা চাপা হয়ে এল। কোথা থেকে যেন বেশ কয়েকজনের নিঃশ্বাস বন্ধ করার শব্দ, অতি ক্ষীণভাবে সতর্ক হওয়ার আওয়াজও পেলাম।

আমার শরীরের প্রতিটি পেশী টানটান হয়ে এল। মাথার মধ্যে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলে গেল, "বিপদ আসছে, বিপদ।"

তাপস অবশ্য সে-সব খুব একটা খেয়াল করল বলে মনে হল না। সে বলেই যেতে থাকল, "শুধু এই নয় মিস্টার গুরুং, আমার কবে থেকে আপনার ওপর সন্দেহ হল জানেন? এখানে আসার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে একটা খটকা আমার মাথায় গেঁথে ছিল, যেটা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কেউ যেন এমন একটা বেফাঁস কথা বলেছে যেটা লজিক্যালি কারেক্ট হতে পারে না। কাল যে মুহূর্তে আপনি আপনার পুরোনো স্যাঙ্গাতকে যোগেন্দ্রজি বলে ডাকলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই আগের খটকাটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল। আর আপনি, এত যত্নে জাল বিছোনো সত্ত্বেও আপনি ধরা পড়ে গেলেন।"

কারও চোখে কোনও পলক পড়ছে না। তবু খেয়াল করলাম গুরুং আর যাদব, দু'জনের বসার ভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে গেছে।

এবং দেবাশিসদা। স্থির এবং ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন। এখনও বুঝতে পারছি না এখানে ওঁর ভূমিকাটা ঠিক কী।

"প্রথম দিন যখন জ্যেঠু আপনাকে চিঠিটা হুমকি চিঠিটা দেখান, তখন আপনি বলেছিলেন যে 'আপনাকে থ্রেট দিয়ে এ-সব চিঠি কে পাঠাবে? না আপনি কোনও বড় বিজনেসম্যান, না আপনি কোনও খাজানার মালিক হয়ে বসেছেন।' যেন তখনও আপনি পুঁথিটার কথা জানেন না। অথচ পরের দিনই, তাশি দোরজির বডি দেখে এখানে যখন আমরা কথাবার্তা বলছি, জ্যেঠু পুঁথিটার কথা উল্লেখ করা-মাত্র আপনি বললেন, 'এটাই কি সেই পুঁথি যেটা নিয়ে আপনাকে হুমকি চিঠি পাঠানো হচ্ছে?' এবার কাইন্ডলি এক্সপ্লেইন মিস্টার গুরুং, কোন অলৌকিক উপায়ে আপনি এক রাতের মধ্যেই জেনে গেলেন যে কোনও একটা পুঁথি নিয়েই..."

তাপসের কথা শেষ হওয়ার আগেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল গুরুং, হাতে উদ্যত রিভলভার। যোগেন্দ্র ওরফে যজুবেন্দ্র যাদব অবশ্য বসেই রইলেন তাঁর সিটে, তাঁর হাতেও এতক্ষণে উঠে এসেছে নাক ভোঁতা একটা বিদেশি পিস্তল। চুক-চুক করতে প্রথম কথাটা তিনিই বললেন, "বাঙালিদের এই একটা দোষ, বুঝলে গুরুং, এরা বড্ড বেশি বোঝে। আরে বেওকুফ, এতই যদি তোর বুদ্ধি হবে তো তোর জ্যেঠুর কাছ থেকে পুঁথিটা ঝেঁপে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সওদা করবি তো আগে। তাতে তোরও কিছু ফায়দা হত, আমাদেরও কিছু ফায়দা হত। কী বলো গুরুং?"

আমার শরীরের প্রতিটি পেশী টানটান হয়ে উঠেছিল। খুব সতর্ক ভাবে বডিটাকে ডানদিকে হেলিয়ে রাখলাম, যাতে দরকার পড়লে বাঁ-দিকে জাম্প করতে পারি। আড়চোখে দেখলাম দত্তবাবুর চোয়ালও ঝুলে পড়েছে। তবে তাপস কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে, হাসিটাও অমলিন, যেন ও জানতই যে এই ঘটনাটা হবে। একমাত্র দেবাশিসদা-ই দেখলাম চোখ বুজে আছেন।

“তাহলে স্বীকার করছেন যে তাশির খুন আর জ্যেঠুর কিডন্যাপ, এর পেছনে আপনাদেরই হাত আছে, রাইট?” তাপসের গলায় এখনও যে কনফিডেন্সের সুর বাজছে, তার উৎস কোথায় আমি জানি না।

“অফ কোর্স ইয়েস, সে-কথাটা বুঝতে তোমার মাছ-ভাত-খাওয়া মাথা এত সময় নিল ব্রাদার?” হাতে রিভলবারটা নাচিয়ে বিশ্রীভাবে হাসল গুরুং। ওকে চেনাই যাচ্ছিল না এখন।

“সে তো বটেই, নইলে আর পুলিশের নজরে থাকা অবস্থাতেও তাশি দোরজি খুন হয় কী করে, যদি না তার পেছনে পুলিশের কারও হাত থাকে? তা খুনটা তো নিজের হাতে করেননি নিশ্চয়ই, কাকে দিয়ে করালেন? আপনার ওই দুই কনস্টেবলের কাউকে দিয়ে, যারা এখন নীচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক বলছেন বটে।” ধীরেসুস্থে এবার উঠে দাঁড়ালেন শ্রীযোগেন্দ্র যাদব, হাতের উদ্যত পিস্তলটা সোজা তাপসের বুকের দিকে তাক করা, “তবে কিনা সে-সব আলোচনা না-হয় আমাদের ডেরাতেই হবে কেমন?”

“তা আপনাদের ডেরাটা কোথায় মিস্টার যাদব?” এতক্ষণ চুপ থাকার পর এই প্রথম বারের জন্য মুখ খুললেন দেবাশিসদা, “গুরুংয়ের বাংলোয়? যেখানে মিস্টার নরনারায়ণ ভট্টাচার্যকে কিডন্যাপ করে রাখা হয়েছে? বেঙ্গল পুলিশ সারা দার্জিলিং খুঁড়ে ফেললেও যেখানে ঢুকেও দেখবে না? অবশ্য সেখানে এখন সিবিআইয়ের লোকজন আপনার পোষা কুত্তাদের ছাল ছাড়াচ্ছে।”

তাকিয়ে দেখলাম গুরুং এর হাত কাঁপছে, হয় রাগে অথবা ভয়ে। সম্ভবত দুটোতেই। “ইউ ব্লাডি সোয়াইন, হাউ কুড ইউ...” বলে রিভলবারটা দেবাশিসদার দিকে তুলল গুরুং।

এবার অতি ধীরে এবং শান্তস্বরে উঠে দাঁড়ালেন দেবাশিসদা। তাঁর চাউনি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখের ভাব, সবই বদলে গেছে। কঠিন ইস্পাতের ওপর বিষাক্ত মধু ঢেলে বললেন তিনি, “হাউ কুড আই? কারণ গুরুংবাবু, তুমি বাংলায় পড়াশোনা করলেও কোনওদিন বাংলার বাচ্চাদের সঙ্গে কানামাছি খেলোনি, তাই না? কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ... কোনওদিন খেলেছো গুরুং? আমার লোকেরা কিন্তু এখন তোমার বাংলোর প্রতিটি ইঞ্চি খুঁড়ে দেখছে...”

গুরুং অবশ্য অত কথায় কান দিল না, দাঁত চেপে আদেশ দিল, “স্টপ ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম, বাগারস। পুঁথিটা চুপচাপ বের করে আমাদের হাতে দাও, ওটা আমাদের চাই, এক্ষুনি। মুভ শার্প বাঙালিবাবু, নইলে তোমাদের চারজনের জন্য আবার বারোখানা বুলেট খরচা করতে হবে আমাদের। হারি আপ, আমাদের টিম নীচে ওয়েট করছে গাড়ি নিয়ে, উই নিড টু মুভ নাউ।”

আমার শরীর তৈরি হয়েই ছিল। আগেও লক্ষ করেছি, এ-সব ক্ষেত্রে মগজ থেকে পেশীতে নির্দেশ যাওয়ার আগেই আমার হাত আর পা কাজ করতে শুরু করে। ওরা অত্যধিক উত্তেজনার জন্য সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বুঝেই আমার পুরো ভরটা ডান কাঁধে শিফট করে শরীরটা ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে দিলাম, বাঁ পা-টা উঁচু করে। সেটা গুরুংয়ের হাতে আছড়ে পড়তেই ওর হাতের রিভলবারটা ছিটকে গেল দেওয়ালের দিকে। উঠে বসে দেখলাম যে দেবাশিসদাও কম খেলুড়ে নন, আমাকে নড়তে দেখেই সামান্য নিচু হয়ে ডান হাতটা সপাটে চালিয়ে দিয়েছেন যোগেন্দ্রর তলপেটে। ভূতপূর্ব প্রফেসরসাহেব যেখানে ওঁক করে একটা আওয়াজ তুলে লুটিয়ে পড়লেন, গুরুং-এর হাতে ধরা রিভলবারটাও সেখানেই ছিটকে পড়েছিল। চকিতের মধ্যে দেখলাম যে গুরুং প্রাণপণে সেদিকে ঝাঁপ দিল রিভলবারটা উদ্ধার করতে। ইতিমধ্যেই দেবাশিসদা যোগেন্দ্রকে পেড়ে ফেলে তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ফেলেছেন। আমি গুরুংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ওর একটা ঘুঁষি আছড়ে পড়ল আমার চোয়ালে। গুরুংয়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে-পড়তে শুনলাম তীক্ষ্ণ সিটির স্বর ভেসে উঠল দেবাশিসদার দিক থেকে, আর চারজন আর্মি কম্যান্ডো দরজা আর

জানালা থেকে ঘরের ভেতরে লাফিয়ে পড়ে হাতে ধরা ইনস্যাস তুলে পজিশন নিল! তার মানে এতক্ষণ ধরে আমার ইন্দ্রিয় আমাকে ভুল সিগন্যাল দিচ্ছিল না!



জামার ভেতরে লুকিয়ে থাকা হোলস্টার থেকে নিজের রিভলবারটা বার করলেন দেবাশিসদা, তারপর সেটাকে গুরুং এর দিকে তাক করে বললেন, "নো মোর হ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি জেন্টলমেন। আই অ্যাম মেজর দেবাশিস বণিক, অ্যান্ড উই আর স্পেশ্যাল আর্মড ফোর্সেস ফ্রম সিবিআই। সো, প্লিজ সারেন্ডার ইওরসেল্ফ টু

আস পিসফুলি, উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিবডি টু গেট হার্মড। তাপস, সুবোধ, প্লিজ স্টে অ্যাসাইড। লেট মাই টিম হ্যান্ডল দিস। আর দত্তবাবু আপনি প্লিজ এই দুই বন্ধুকে নিয়ে... দত্তবাবু... ও দত্তবাবু...”

আমরা সবাই একসঙ্গেই দত্তবাবুর দিকে ফিরে তাকালাম। ভদ্রলোক এতটা মানসিক শক বোধহয় একসঙ্গে নিতে পারেননি। উনি চেয়ারেই পড়ে আছেন বটে, তবে অজ্ঞান হয়ে !

*

দু’দিন বাদের ঘটনা। আমরা রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আমরা বলতে অবশ্য আমরা তিনজন। আমি, তাপস আর নারানজ্যেঠু।

নারানজ্যেঠুকে গুরুং-এর বাংলো থেকে সেই রাতেই উদ্ধার করে সিবিআই-এর টিম। সামান্য মেন্টাল ট্রমা ছাড়া বিন্দুমাত্র টসকাননি ভদ্রলোক। কিন্তু এত ঘটনার পর জ্যেঠুকে আর দার্জিলিংয়ে রাখতে ভরসা পাইনি আমরা। দেবাশিসদার কাছ থেকে স্পেশাল পার্মিশন বানিয়ে খানিকটা জোর করেই আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

“আমি তো জানতামই যে এ-রকম কিছু একটা ঘটবে।” এসি কম্পার্টমেন্টে বসে জানালায় প্রতিবিম্বিত বাইরের অন্ধকার খুব মন দিয়ে দেখতে-দেখতে বলছিলেন নারানজ্যেঠু, পিঠের কাছে ওঁর নিজেরই স্পেশ্যালি ডিজাইন করা একটা লম্বাটে কুশন, “নইলে আর তোমাদের ডেকে পাঠানো কেন?” অন্যমনস্ক সুরে বললেন জ্যেঠু।

“কিন্তু তাই বলে এতদূর? যদি আপনার কিছু হয়ে যেত?” জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

“সে হতেই পারত। তবে বাঁচোয়া এটাই যে আমাকে মারধোর শুরু করার আগেই তোমরা ফাঁদটা সাক্সেসফুলি পেতে ফেলেছিলে। তা নইলে কী যে হতো সেটা বলা অবশ্য সত্যিই খুব মুশকিল।” বলেই আবার বাইরের অন্ধকারে মগ্ন হয়ে গেলেন মানুষটা।

“কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না তাপস...” ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম।

“কী?”

“দেবাশিসদাকে হাত করলি কী করে?”

“ওঁর ওই মিলিটারি বুট দেখেই বুঝি যে ভদ্রলোক সাধারণ ট্যুরিস্ট নন। তারপর আমাদের সঙ্গে ম্যালে দেখা হওয়ার দিন নিজেকে কিউরিও শপের মালিক প্রমাণ করতে গিয়ে গুচ্ছের ভুল ইনফর্মেশন দিলেন। সন্দেহটা আমার তখনই হয়। কলকাতাতে খবর নিয়ে জানলাম নিজের দোকান বলে দোকানের যে নাম উনি আমাদের জানিয়েছিলেন সেটা আসলে ওঁর এক বন্ধুর দোকান। আমিও অবশ্য কম যাই না। সেই বন্ধুকে পটিয়ে পাটিয়ে অনেক কষ্টে জানলাম যে তাঁর স্কুলফ্রেন্ড শ্রীদেবাশিস বণিক আসলে একজন আইপিএস অফিসার, দিল্লিতে খুব উঁচু পোস্টে কাজ করেন। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে আমার দেরি হয়নি, আমি ভদ্রলোকের হোটেলে গিয়ে ওঁকে সরাসরি সব জানাই। তখনই জানতে পারি যে উনি এসেছেন সেই আন্তর্জাতিক চোরাচালানের পান্ডাটিকে খুঁজতে। ব্যস, বাকি অ্যাকশনের প্ল্যান তখনই ফাইনাল হয়ে যায়। যোগেন্দ্র অ্যান্ড কোং যখন জ্যেঠুর লাইব্রেরিতে বসে তড়পাচ্ছে, তখন গুরুংয়ের বাংলো সার্চ করানোটা ওঁরই কাজ।”

“কিন্তু একটা কথা বল, যেটা নিয়ে এত কাণ্ড, সেই পুঁথিটা কোথায়?”

আড়চোখে জ্যেঠুর দিকে তাকাল তাপস। তারপর তাকাল জ্যেঠুর পিঠের দিকে রাখা লম্বাটে কুশনটার দিকে। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব আস্তে করে বলল, “হ্যাঁ রে তেমন-তেমন সাধনপীঠ হলে বোধহয় পিঠের ব্যথাতেও সমান কাজ দেয়। তাই না রে?”



অভীক সরকারের জন্ম ১ জুন, ১৯৭৯ সালে। বেড়ে ওঠা প্রাচীন শহর হাওড়ার অলিগলিতে। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, মা স্কুল শিক্ষিকা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক, রয়েছে ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও। চাকরিসূত্রে হায়দ্রাবাদ, মুম্বই ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে জীবন কাটিয়ে আপাতত কলকাতায় থিতু। পেশায় সেলসম্যান, কাজ করেন একটি বহুজাতিক সংস্থায়। boichoi.com নামক অনলাইন পুস্তক বিক্রয় কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। লেখালেখির শুরু ২০১৫ সাল নাগাদ। প্রকাশিত বইগুলি হল 'মার্কেট ভিজিট', 'এবং ইনকুইজিশন', 'তিতিরপাখি ও প্রিন্সেস' (সহলেখক অনুষ্টুপ শেঠ) এবং 'খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ'। বিবাহিত, একটি দশ বছরের কন্যার পিতা। ভালোবাসেন ইলিশ, ইস্টবেঙ্গল, ইয়ারবন্ধু এবং ইতিহাস।

ISBN 978-81-944453-1-9

9 788194 445319

ebook ₹ 100.00

মায়াকানন